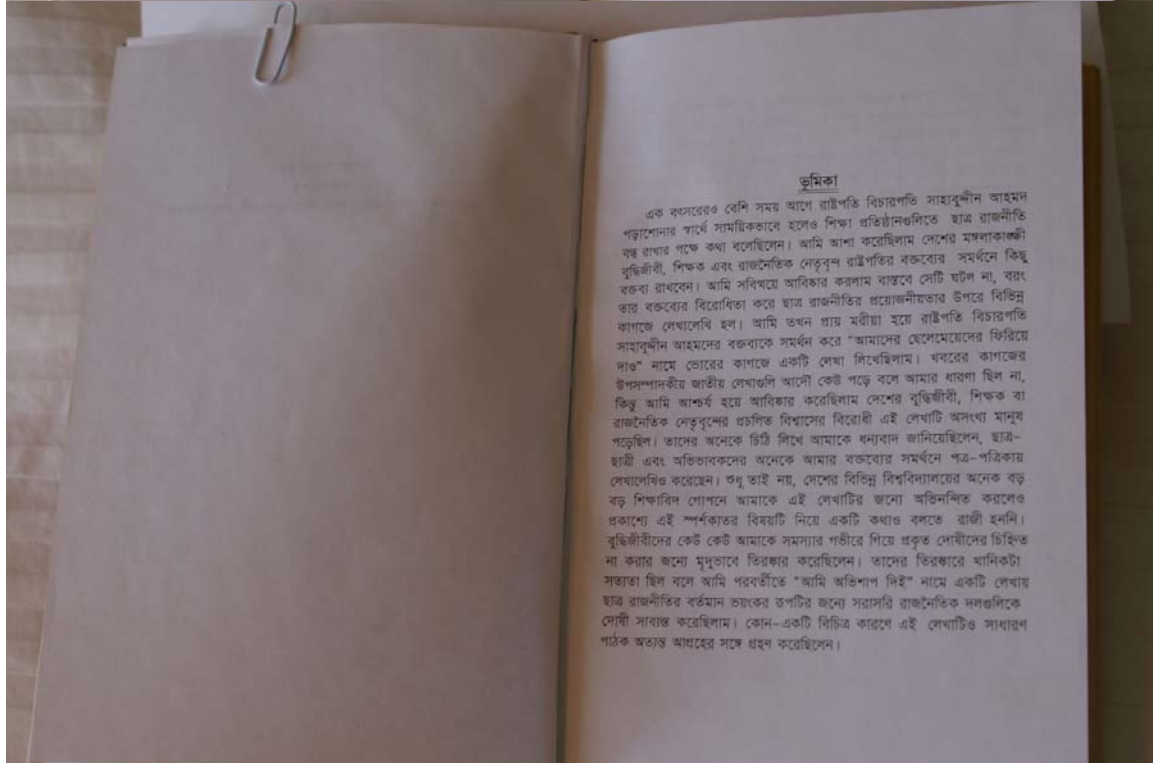
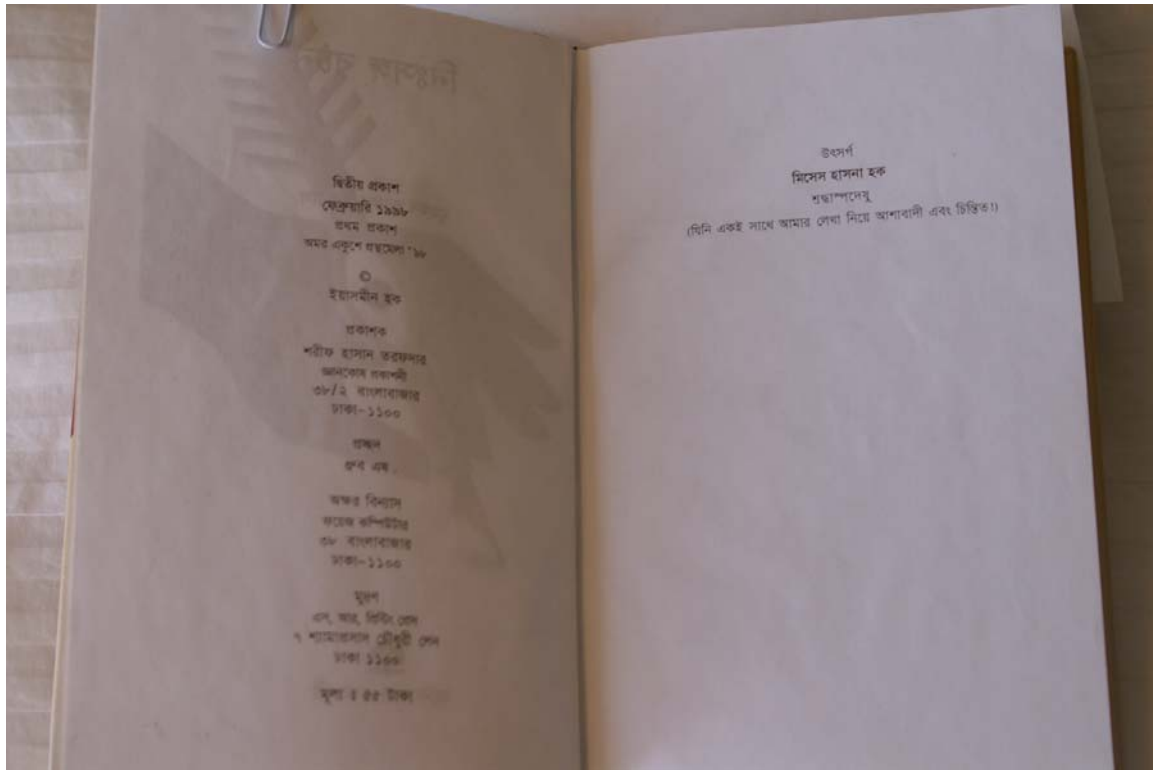


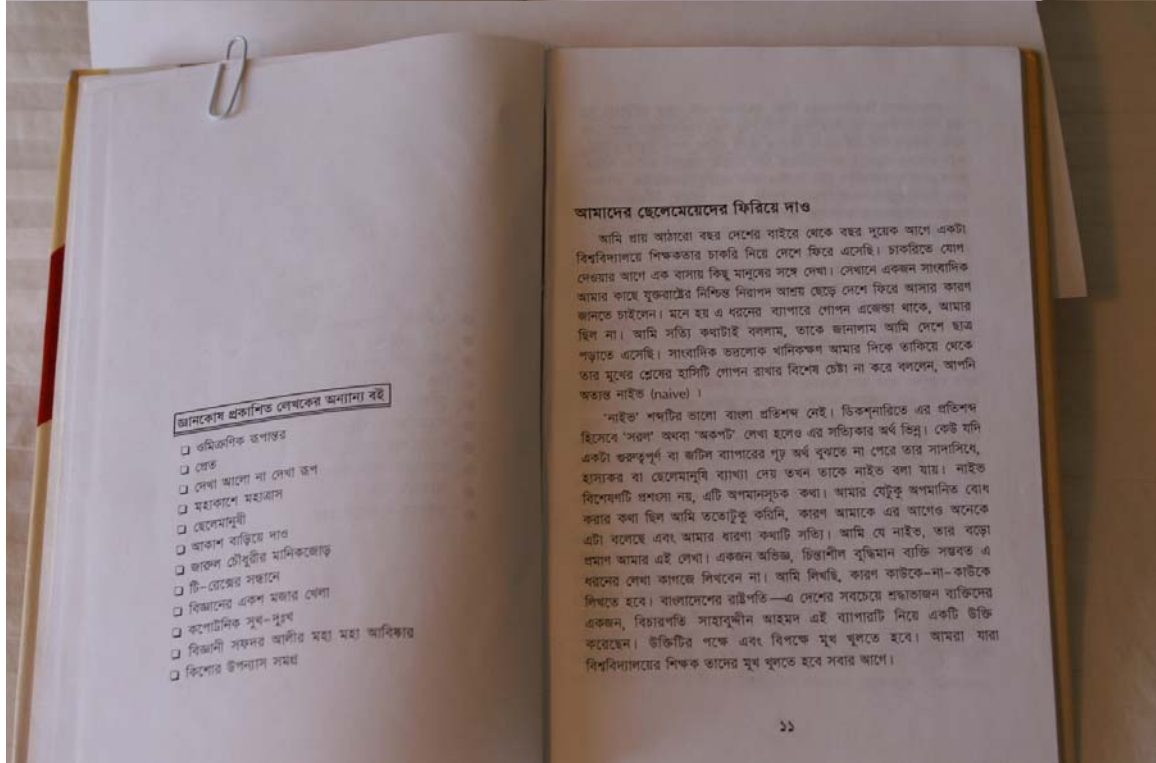
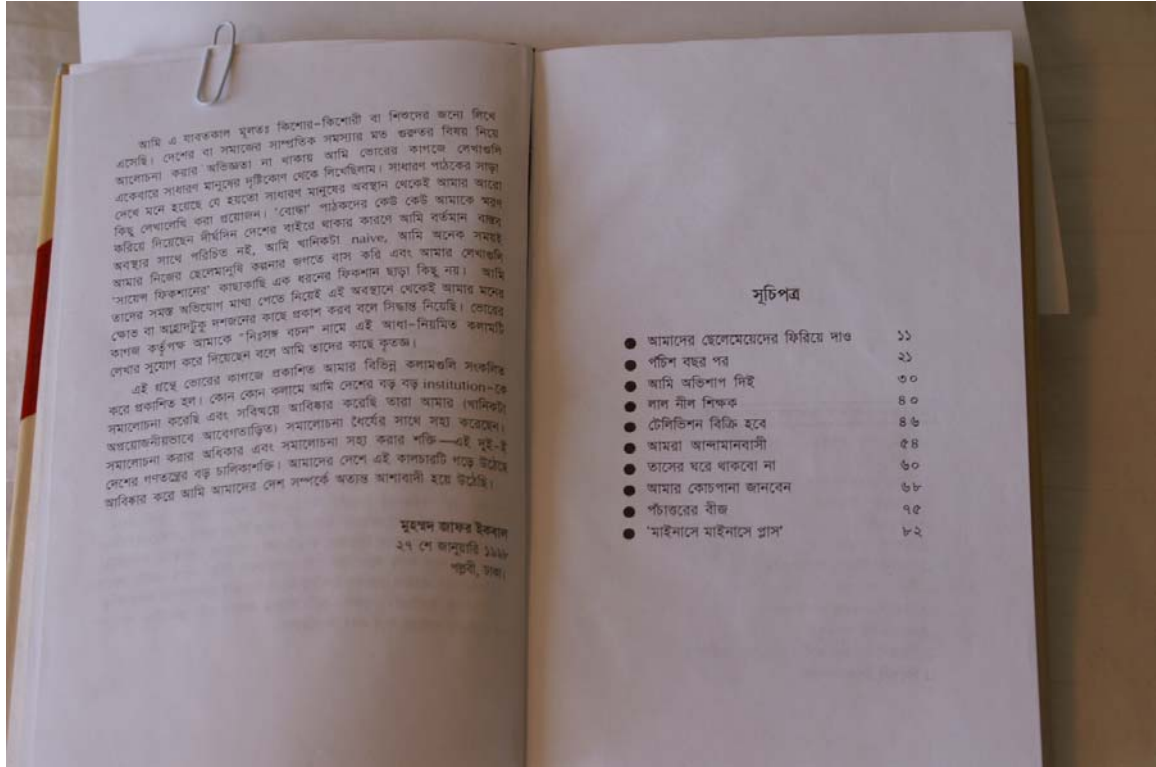
we request you to join our text and voice chat



[www.shopnil.com](http://www.shopnil.com)



**www.shopnil.com**  
we request you to join our text and voice chat



[www.shopnil.com](http://www.shopnil.com)  
we request you to join our text and voice chat



[illegible][illegible]

যেখানে সম্পূর্ণ শান্তিধূর্ণভাবে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একজন ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে আবিষ্কার করেছে যে, সে দেশের সর্বকনিষ্ঠ শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন গড়ে উঠেছে, কোনো কিছু গড়ে উঠতে দেখার মতো আশা আর কিছুতে নেই। যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তুলছিলেন তারা আমাকে সাপের তাদের মাঝে গহণ করছেন। তাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি এক ধরনের গর্ব অনুভব করি—নাইট মানুষের গর্ব কিন্তু গর্ব তাতে সম্বন্ধ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমি জানি এই সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতি আসলে একটা ভালের ঘরের মতো পাকিয়ে আছে। এটি যেকোনো মুহূর্তে ধসে যেতে পারে এবং তার একইটি মাত্র কারণ সেই হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি—আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দী আহমদ যে ছাত্র রাজনীতির কথা উল্লেখ করেছেন সেই ছাত্র রাজনীতি।

২. যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এখানে একটি-স্বাক্ষরী ঘনিষ্ঠতা (একটি ছাত্র অন্য একটি ছাত্রের প্রকাশ্যে ঘোরা গিয়ে আশ্রয় করে নেবে) হলে অধ্যাপক কর্তৃক যোগ্যতা বর্জিত করে দেওয়া হবে। অধ্যাপক কর্তৃক যোগ্যতা বর্জিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে যাদের রোলস্টোন সল্টম্যান সজ্জিত সম্পদ, ক্রাউস সল্টম্যানের নিম্নোক্তের দ্বারা ব্রহ্মা করণ অর্থ সমস্যা হয় হবে (১)। সর্বোপরি দেশের জাতীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতিও তাদের অর্থ সল্টম্যানের সহায়তা পেওয়ার কারণে নেওয়া হবে এবং সেখান থেকে নেওয়া পুরো ব্যাংকারী একটি কৃষিগত তদন্ত নিয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ক্রম পেওয়া ছাত্রা তার কোনো উপায় থাকে না। এরপর অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে বাস্তবস্থানটি ব্যাংকারের আদায়করণ করেন। নিম্নে শহরের নিজস্ব রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বস্থান থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মুখোমুখি বাস্তবায়নের একটা পরিবেশ তৈরি করেন। সেই অবস্থানটির অনুপ্রাণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যে সমস্ত রাষ্ট্রপতির লক্ষ্যবস্তুর অনুপ্রাণিত হলেই হয়েছিল তারা দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাংকার ছাত্রদের ব্যবহার করে। তাদের ব্যবহার করে কোনো ব্যাংকার হস্তক্ষেপ না করেন। জার্মানোমিটারের দৃষ্টিকোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যবস্তুর অন্তর্গত যেকোনো যৌক্তিকতা

[illegible][illegible]

জন্ম শিক্ষিত হয়ে সেখানে ফিরে এসে সেখানের হাল ধরার গুরুত্ব নিচ্ছে। সেখানের ভিতরের শিক্ষা ব্যবস্থা খারাপ হলেও তারা প্রত্যক্ষভাবে সেটা অনুভব করেন না, সেটা দিয়ে জেয়ালো একটা রাজনৈতিক বক্তব্য হয় তার বেশি কিছু নয়।

৩. হাটপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তার রায়ানীতি প্রচলানোয় তিনি অনেক ভাষণে ভাষণে কণা শোনা যাবে। তার মতে কিছু নতুনত্ব রয়েছে কিন্তু এই হাট রায়ানীতির কারণে দেশের ছাত্রছাত্রীদের শড়শাশোনা, তাদের মূল্যবোধ, নৈতিকতায়, চিন্তাধারায়, স্বাধীনতায় যে কায়দে সর্বদা ঘটেছে শুধুমাত্র সেটা বিবেচনা করেই যেকোনো মূল্যে হাট রায়ানীতিতে বদল করতে হবে। রায়ানীতি কারণে সবার সমান অধিকার নেই অধিকার কেউ কারো বাহ্য থেকে দিয়েছে মনে পাবেন না। কিছু বিখিন্যাদেশ হাট হিসেবে মরেশে কায়দে পর ক্যাম্পাসে সে কী করতে পারবে অথবা কী করতে পারবে না সেই বিষয়টি নির্দিষ্ট করে অধিকার বিখিন্যাদেশের ওপর।

[illegible]

আলোরকে শাসন করণীয়া নিয়মের কাঠের বাগানের উপায় নেওয়া হয় না। তারা যে কাজটি করতেই আসলেভাবে করতে পারে আলোরকে সেই কাজের জন্য সজ্জা রাখা হয়—সেটি হচ্ছে আলোমণ্ডল।

[illegible]

৪. দেশে অসংখ্য মূল-কলেজ-বিদ্যালয় রয়েছে, তার সব কটির খবর জমি না। খবরের কাগজে বা ছাপা হয় তা থেকে খারশা করতে হলে খরচ হবে খবর বেশি ভালো নয়। আমি শাহজালাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক হই তাই খবর আমি নিশ্চয়ভাবে জমি। যদি এই বিদ্যালয়টিকে একটি পরীক্ষার খরচ আমি নেই তাহলে এই পরীক্ষাচারে পাওয়া তথ্যগুলো এরকম:

(ক) সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে। যদি কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে দেওয়া যায়, তবে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি দেখতে চলে কিনা—ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাক্রমে ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে গভীরে গভীরে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্যাম্পাসে ছাত্র

রাষ্ট্রনীতি বন্ধ করে কোনো লাভ নেই, তাহলে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রনীতি বন্ধ হয় না।  
 যদি ক্যাম্পাসে ছাত্র রাষ্ট্রনীতি বন্ধ করতে হয়, তাহলে এক সঙ্গে সব জায়গায়  
 বন্ধ করতে হবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো একটি ঘটনা ঘটে গেলে প্রত্যেকটি অঙ্গ সংগঠন  
নিজস্বভাবে স্বাধীন ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

(খ) একবার একটি ছাত্র কোনো রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠনে যুক্ত হলে সে

তাকে কোনো-না-কোনো অঙ্গ সংগঠনে থাকতে হয়। এক  
সমীক্ষিত হয়ে ছাত্ররা কল্টিন মাসিক অনা সংগঠনে নেতা হিসেবে যোগ দি  
থাকে।

(ঘ) কোনো কোনো ছাত্র সংশ্লিষ্টমতে সাধারণ ছাত্রের সন্তিকার অর্থে ভাষ্য। আমি তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে অবিকার করেছি— ছাত্রের গোপন প্রকৃত অপর্যায়ের নাম আমার কাছে প্রকাশ করে গেলেও কমিটির সামনে কিছতেই নুখ ঘুলাবে না।

১৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো একটি নামেমার জাতিয়ে মেলো, নামেমার নিজস্বের কথা কায়র জন্ম অনেক সময় ভবিষ্যৎ করে কোনো একটি সত্যিই যোগ দিয়ে দেয়। বিশ্বনির আসে একজন ছাত্রেরা নামার কাছে আসাফাল কয় দেবে গেলে যে, তাদের বলে সত্যি যোগ দেওয়া একজনের বিকল্পে কোয় নামের শক্তি দেওয়া হলে তারা সত্যি যোগ নেবে না।

(৩) ছাত্রেরা তাদের নিজস্বদের অঙ্ক সমাধানের সময়স্বয়ের রক্ষা করার জন্য সাধারমতে ঠিক করে থাকে। সেই ঠিক ঠিক প্রায় সময় নীতি বহির্ভূত হয়ে যায়—যদিবা সাক্ষী দেওয়া অসম্ভব দাবির প্রতিবেদন আবার আলমরিগেটে সহজে রক্ষা করা যায়। নীতি এবং আদর্শ বলে যে জিনিসটি তরুণ ছাত্রদের মাঝে থাকার কথা।

কিছুদিন আগে সম্ভাব্যেবা হঠাৎ করে আমার কাছে টেলিফোন এসেছে, টেলিফোনে একজন ছাত্র আমাকে জানালো আমার একটা ছাত্র ভুলি হয়েছে, সে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে আছে। খবর পেয়ে রাস সবে সঙ্গে আমি হাসপাতালের ছাট গেলাম। ডেস্টোর্টি তখন ইমার্জেন্সি থেকে বের করে একটা

[illegible]

আমার ক্ষমতা ছিল না তাই বলা  
কাল বোক আমাদের বলতে হবে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ  
বলেছেন, আমাদেরকেও বলতে হবে।

[illegible]

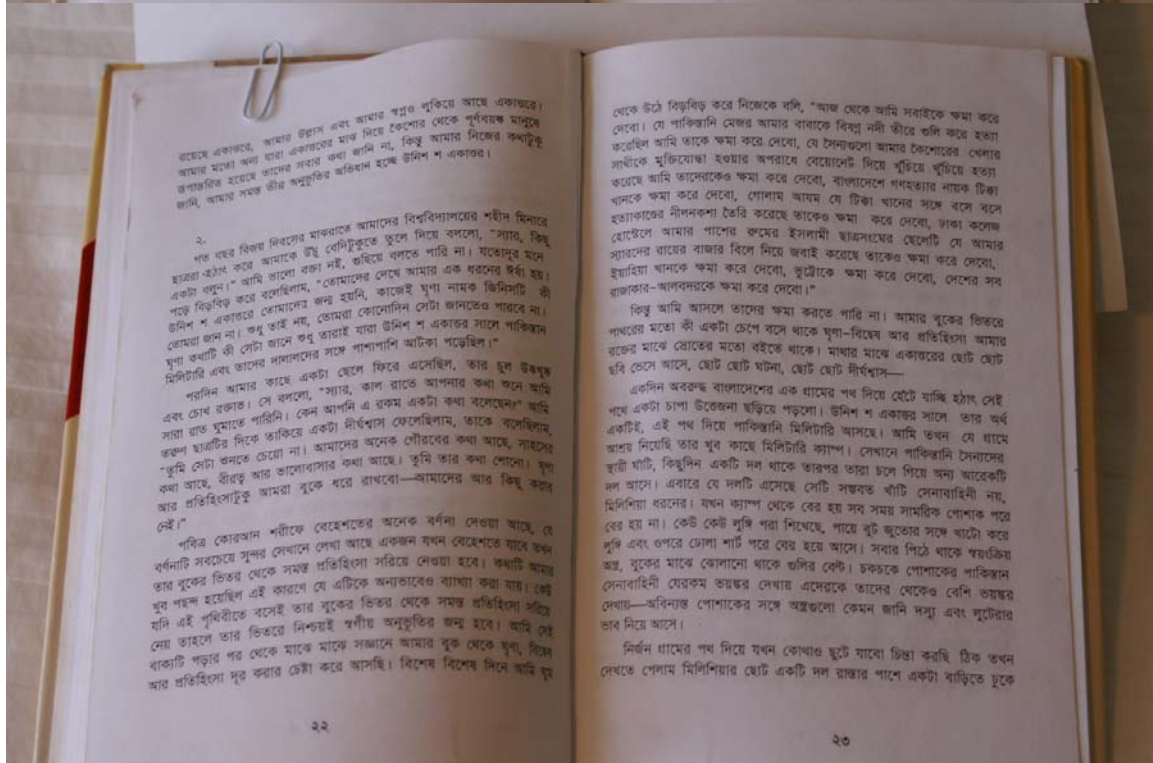
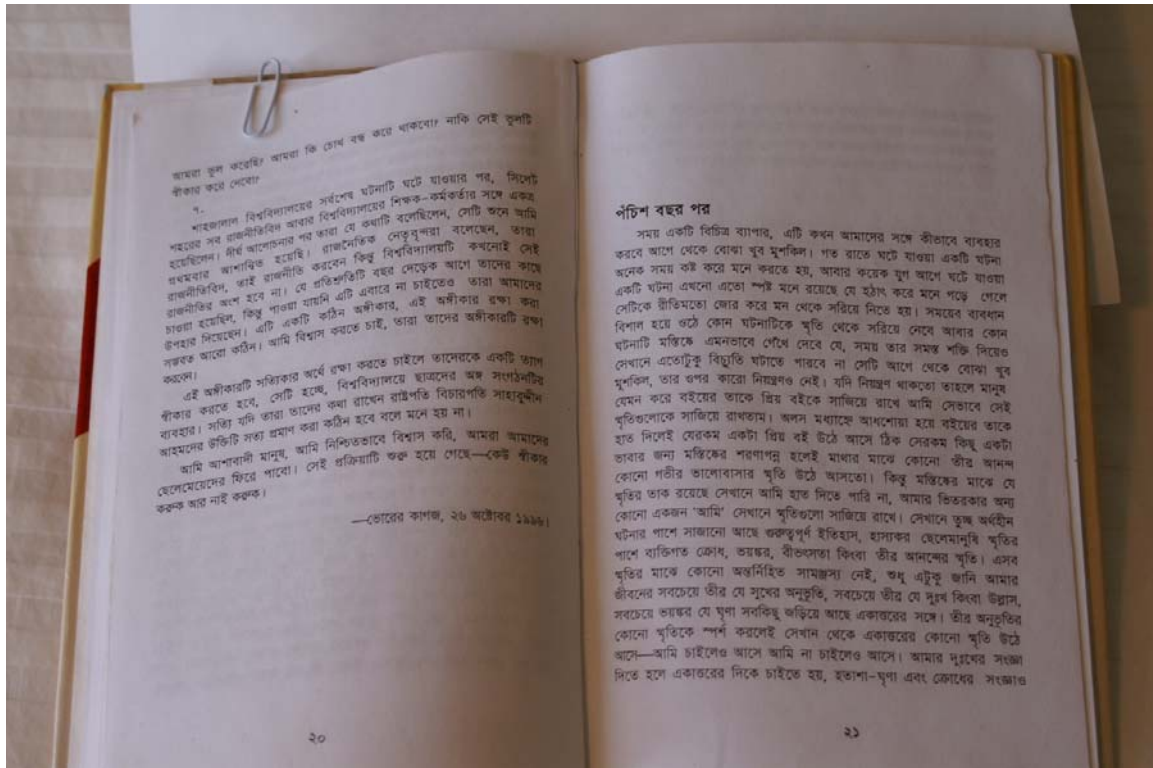
খানি আমার হাতের কাজ সরিয়ে রেখে নরম গলায় মেয়েটির সঙ্গে কথা বললাম, তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, মা-তাই-বাবেনের কথা জানতে চাইলাম। বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় চিঠি লেখার উপলক্ষে মিলাত। সেখতে সেখতে খুটি চলে আসলে বলে সাধুনা মিলাত। কথা বলে মেয়েটির মন ভালো হলো, সে আমার কাজ থেকে বিদায় নিয়ে গেলো।

আমার কাজ থেকে বিদায়ের বেশির ভাগা ছাত্র, এই মন খারাপ হয়ে যাওয়া।

[illegible]

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসলে হাক্কাল আর কানের কথা কারো চোখে আসেন না। আমাদের চোখে সামলেন কেউ আসেন রাজমন্ডিরের পল্লভাণ্ডের পেশকাম্বা কান্ধারের ছবি, কটা ছবিইহলে হাতে মুক্তি-বোধশিক্ষার যাবতীয় অসুবিধা অতিক্রম করে যাবতীয় ছবি। তারা সবার নানান ছবি, হাতে পোনা যাব কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধ্যা ছাত্রইহলে এই ছবি পোনা অকল্যাণের কলঙ্কবর্ণের বোঝা নিজেরের সূঁচের করে যাবত বকতে হোক। সন্ধ্যার এর সময় গাড়ি নিয়ে একে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নোকে না। গাড়ি ছাড়ার হলেও নিজস্ব-ইহাক্কাল হওয়ায় ছবি। মাসখানেক না। সাময়িকভাবে আসে হাক্কালগির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরিচয় করে এক সাময়িকিক কল হওয়ায় টেনেশ্যাকলের সঙ্গে এক ছাত্রের কলসা থেকে, বাপ সাময়িকিক কল হওয়ায় টেনেশ্যাকলের সঙ্গে এক ছাত্রের কলসা থেকে, বাপ টিয়েয়ে গাড়ি ছাড়ার নিয়ে— শেষ পর্যন্ত পুলিশের নাকের ডকে, বাপ ছাত্রের মনুষ্য শাসিতগির নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিয়ে সেটিয়ে কলসা পরিচয় করে গেয়ে। কিন্তু সাময়িকীরা বিশ্ববিদ্যালয়, তারা ছাত্র-শিক্ষক সবার সেরে মজরা করে, আমি নিজের কানে সেতলা কলসা, শুনে গিটে। দেশের সবচেয়ে বিদ্যাপীঠ সর্বশেষ সামান্য সাময়িকীরা ভিতরে গির ঘূণা কেন্দ্র করে জন্ম নিলো। আমরা কটা এর জন্য দীর্ঘ নই।





পড়লো। আমার সেই মুর্তি দেখান থেকে সরে পড়া ভারত ছিল কিছু কিছু  
একটা আমার পাতক হারি নামে বৈষ্ণব ফেললো, আমি সেখানে ছাপুর মতো  
পড়িয়েই বইলাম।

[illegible]

সকলি হতে পারে না।  
কিন্তু সেটি সীতা ছিল, একমল মিলিশিয়া যখন এই মানুষটির হাতকে জে  
অবিলম্বে—আমি সীতাকেই এর বাংলা প্রতিশব্দটি লিখতে পারলাম না, ইহা  
আমাদের কথা কতজন, আমাকে যেন কতজন। আমি তার চেয়ে  
মানুষকে তখন আমার পাশে সীতাকে ঘরঘর করে কোঁপছি। আমি তার চেয়ে  
মিলে থাকিয়েছিলাম, সে যে শুন্যাতীতে ভাকিয়েছিল পৃথিবীর কাঁটকে যেন সে  
সকলি সীতা লেখতে না হয়।

[illegible]

ହସନ ଏକଜନ ସୁନାମୁଞ୍ଚିତେ ଆକିଷେ ଧାକେ ମେଇଁ ମୁଞ୍ଚିକେ ମହା କରା ଯାଉ ମା । ଆମି  
ମେଠି ମହା କରକେ ନାହିଁ ମା ।

আমার খুঁটিতে এ রকম অসংখ্য ঘটনা বাসা বেঁধে আছে। আমি কেমন করে এর সব ভুলে গিয়ে বুকের ভিতর থেকে সব মিথের বিষ সঠিতে সেবো? এই পৃথিবীতে আমাকে কী আশঙ্ক নরকবাসী হয়েই কাটতে হবে?

3.

তিনিশ একাত্তরের ইতিহাস কিছু সুখ-ভয় নির্মিত আর হিংসার ইতিহাস না। একাত্তরের ইতিহাস হচ্ছে আমাদের বীরত্ব এবং মহত্বের ইতিহাস। আমাদের শত্রুর ভাষাবাসীর ইতিহাস। আমাদের আপস আর গল্পের ইতিহাস। পাকিস্তান নামক দেশ এবং তার সেনাবাহিনী যখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই দেশটিকে আর দেশের মানুষকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে তখন আমরা আত্মরক্ষার করেছি মানুষের বুদ্ধের ভিতর ভাষাবাসী।

সব আছে একতরে এক সময় আমাদের পুরো পরিবার দুটি ঘোঁট নৌকার  
করে নদীর পানিতে তেলসিঁ—কোথায় বাবা! গান! না! শুভরহৎ একবারের  
জানিয়ে নুনা হতে পারে আছে, নদীর কাছাকাছি পানির নীচে জাঙ্গা করে  
জাঙ্গা করে একটি-দুটি কুকুরের সৈন্যে বেয়ে থোকা বাবা! একজন তখন নদীর তীর  
করে হাত চাড়ে, ভেঙে আমাদের তার বাজিতে আশ্রয় দিয়েছিল। পানির ছিল  
সেই বাবার চোখের, তার পুষ্টিয়ার গা আকাশ খালো করে আছে। অসম্ভব  
মানুষের বাসায় রাত কাটিয়ে, হঠাৎ দেখি সেই অস্বাভাবিক আকাশ করে  
জাঙ্গাওয়া মানুষটি হুপি কানি ঘর থেকে বের হয়ে বাসে। মানুষটির পরিচয়  
জানলে নেই, তার কী চেষ্টেপা মানুষ জানি না, নিদ্রার পানিতে আত্মের  
জাঙ্গা করে হয়ে বসে ইলিশ। মাঝে মাঝে এক-ধর মানুষটি কিরে এসে, কিজে  
করলেন, হাতে কতটা কাটা, কোমরের বাঁধা মনে হয়েছিল। বাবা মা জিজ্ঞেস  
করলেন, “কোথায় গিয়েছিল বাবা?” মানুষটি সুকৃতি পলায় খালো,  
“আমাদের ঘর থেকে বেয়ে বাসায় পৌঁছাব কিংবা খালো বাবার নেই।” ভাবলেন  
নদীতে জাঙ্গা বেয়ে দেখি, নদীটা মাঝ দরতে সেরাম কিনা। মাঝতোলা দুইটি বসিয়ে  
গেলি। সঙ্গে চারটি ছোট চুটিয়ে দিই মা-বাবাভোজ্য কিছু খেতে পারবে।

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ—୩

24

একাত্তরের অন্ধকার রাত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সেই ভালোবাসার  
স্বপ্নি কুসুমি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মানুষের প্রাণ  
স্বপ্নি কুসুমি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মানুষের প্রাণ

[illegible]

আমরা বড়ো গৃহক থেকে বের হয়ে আসছি।  
করে ভাসেবে বলে, "আমি খান খানি বন্ধ করে যা লাগবে" হাসি মেয়ে  
নৌকায় চৌকো হয়ে দিয়ে যা মাঝে জাল তুলে আমায় করে একই ক  
আপনাকে কেউ কখনো ফুলের মালা দিয়ে পানাম করেনি, কেউ আমায়  
গন্ধ পরিবেশে দেয়নি; কিন্তু এই যে দেখছেন আকাশ আর এই যে দেখছেন  
আর এই যে বাতাস যেটি আমরা বুকে ভরে নিশ্বাস নিই তার সবই  
আপনার জন্য। আপনারা যেটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। হস্ত  
আপনার সত্যনো, তাদের সত্যনো যতদিন এই আকাশের দিকে তাকা

এই মাটিতে পা ফেলে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে, তারা আগুনাসের কাছে কতটা থাকবে। কেউ হাতের মুখ ফুটে বলবে না; কিন্তু সব কি মুখ ফুটে বলতে হয়।'

6.

ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে আমি ঢাকায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে খবরটি যখন পেয়েছি তখন অস্ত্রকান হয়ে এসেছে, আমি সেই মুহুর্তে যাত্রাবাহীতে, ঢাকা শহরে আসতে পারিনি। পরদিন কোরে গায়ে হেঁটে শহরে এসেছি, আকাশে সূর্য ঠাট্টাচ্ছে, বরষা পড়ছে সেই সূর্য তার নরম আলো ছড়িয়ে দিয়ে একটি মুক্ত জাতি দেশের ওপর। আকাশে-বাতাসে এক অনাশ্রুতী উল্লাস, এক বিদ্যাকর উৎসব।

[illegible]

আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখছি। ইতিহাস বাড়ো নির্মম  
 সোনার বীরদের পাশাপাশি বিশ্বাসঘাতকতার কথা লিখতে হয়, তার পা  
 লিখতে হয় নৃশংসতার কথা। এখানেও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ এ  
 বীরদের পাশাপাশি রয়েছে এ দেশের এক শ্রেণী মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা এ  
 তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিহিংসা চরিতার্থ ক

25

40



[illegible][illegible]

সীমার পূর্ণতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়।

[illegible]

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী বড়ো আন্দলের দিন। দুখ বুকের মাঝে গোপনে  
 চোখে রাখতে হয়; কিন্তু আন্দলের অংশ দিতে হয় সবাইকে। আজ এই আন্দলের  
 দিনে ক্যাম্পে ক্যাম্পে আটকে থাকা মানুষগুলোকে কি কোনোটাবে আমাদের  
 আন্দলের অংশ দিতে পারি না।

—তোরের কাগজ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

আমি অভিযান দিই

**জাতি অভিসন্ধি** **দ্বি**  
যখন কারো কারো মনিয়ে সেটু তৈরি হলে। আরেক মাকে মাকে ধরলে  
কাজের তার হই যাহা হই। কাজ আরেকের এলিয়ে এলেন। সেটুই মোটামুটি  
পারিলে দেখে, সেবে বড়ো ভালো লাগে। তাহলে তাহা একটি বিধিই কারো  
জানো গোপন সব লগ্নে আমি নিজের কিতরে কাজ গরনে যুগা দেবতর কাজ  
জানো গোপন সব লগ্নে আমি নিজের সেনে সব কাজ তে—যাহা পুষ্টি  
পুষ্টিই শক্তকা মূর্তির মনুসে বালাসেশের, এর জনসভা তারা জানোদের  
বিধি পক্ষাভাব মূর্তির মনুসে বালাসেশের, এর জনসভা তারা জানোদের  
সমান, যুগাভিহা যার অর্থে অর্থ এহি দেশে আবারা এখানে যাহক  
ইঞ্জিনিয়ার, বিদ্যালী, মুসলিমসি হইতে কাজের পারিনি যারা এলিয়ে সেটু  
কাজের পায়ে। যখন বুজলে সেটু তৈরি কারো কাজ আমাের বহিয়ে একটি  
সেতের যাহাখুচী হয়ে কাজের পায়ে। অর্থ এনোটি তৈরি কারো যাহি না  
কাজে উদ্যোগের কাজে পরিবেশের মধ্যে থেকে আমাের পায়ে সেটু  
সম্পূর্ণ গিলে সেটু যাহাখুচী করে ফারাকা বীথ তৈরি কহালে বীথের  
কাজের যাহা তৈরি হইলি সেটি ত্রিক করতে সেতেরে কিনা সেহি অর্থ  
আমাদের সেতের মনুসের থেকে ভালো করে সব কাজ জানে।

তথ্য কি যমুনা সেতু নিয়ে কেতোর না, আরো আছে। একটি আন্তর্জাতিক সম্মত জার্নাল হাফিংটন পুজিও কোথাও এই দেশের কোনো বিশ্বাসী গবেষণার কোনো চিকিৎসা পাতাও বলে না। হঠাৎ হঠাৎ একটি-দুটি পরিচিত নাম পাতাও বলে দেখা যাবে এ দেশের সেই সোনার ছেলের গবেষণা হয়েছে দেশের বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্য কোনো গবেষণাগারে।

পৃথিবীর প্রতি জনস্বজন মানুষের একজন বাংলাদেশের, তবু আমরা বাহিরের পৃথিবীকে এখানে কিছু দিতে পারিনি। দেশের বাইরে যাওয়ার সময় মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এয়ারপোর্টে যাকিকফতের জন্য ধামত হলে এ দেশের কিছু শ্রমজীবী মানুষ দেখা যায়, এয়ারপোর্ট কাভারমোহা করছেন, জমজল পরিচর্যা করছেন। দেখা নয়, তারা এসেছেন পারিবারিক শ্রম দিতে; তাদের দেখে অসহ্য

হয় না, বুকের ভিতরে এক ধরনের সমাবেশনা অনুভব করতে হয়। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য বা উত্তরবিশ্বের আমাসের অনেক আছেন, কিন্তু তারা আছেন গুরোগুরি নিজেদের জন্য। সেখানে তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে চমৎকার শ্রীচরণ্যপন করছেন তার বেশ কিছু নয়।

বাইরের পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশ খুব সমানজনক অবস্থায় নেই। স্বাধীনতার সপ্তাহেরই সপোচিকা 'কামানী মজি' বন্দে পরিচয় করে সেওয়া হয়েছিল, তখনই বন্দে মুখ-মজি, দারিয়া আর বুধা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার শীর্ষক। আর সেখান থেকেই মুখ হচ্ছে পৃথিবীক, অসোমসা এবং বন্দা বাংলাদেশের মতো পৃথিবী কথায় পৃথিবী শাস্তা গর-উপাসো পর্জি সেয়ে বাংলাদেশের অপমানিত বোধ করে এসে। বাইরের পৃথিবী সন্তকত এই সপোচিক সেয়ে গর করে এসে, টেলিভিশন ধরবে কিংবা বন্দে বাংলাদেশের পুরো পৃথিবী এটি কখনো আসে না। সেবার এটি হেডসাইন সয়েছিল '১৩ ন্যাং-যখন কামানী দারিয়াই পেশ ছাড়া কখনো। বাংলাদেশের নির্মম্বি বিবেচনার সয়ে তখন বন্দে একটি পেশ যুক্ত হলে—এটি মৌলবাদীরা পেশ। এই দেশে একটি ময়েকত করা দারিয়া মৌলবাদীরা ছুটত এবং দেশ কাকে ছাড়া কখনো মতো আসে বা ছাড়াই সয়েকত। ১৯৭১ সালে যখন স্বতন্ত্রত্ব সুরিবারে মূলসত্যকবে হত্যা করা হয়েছিল তখন দারিয়া এদবার বিবেচনা বাইরে গিয়েছে হেডসাইন সয়েছিল, অমি তখন বাংলাদেশের পঠিত, তাই কিতাবে বন্দার উল্লাসন করা হয়েছিল অমি জানি না। যে মানুষটি কখনো একটি কিতা সয়েকত হয়ে মারীতা অর্জন করেছিল তাকে সপঠিতবে মূলসত্যকবে ত্যাগ করা কত বিবেচনার শাস্তি আছে। বাইরেও নির্দীন বন্দে কত সয়েকত হয়েছে। বাংলাদেশের পঠিতা শুধু মুখ-কই, দারিয়া, বুধা, পৃথিবীক, বন্দা এবং মৌলবাদীরা—তাঁরা পরিচয় করে এই মূলসত্যকত্ব শুধু হয়ে আছে।

বাংলার পৃথিবীতে বাংলাদেশের কোনো সমানজনক পরিচয় নেই, দেশটির জনা আদামা করে রাখা বিশেষণগুলো খুব নির্দিষ্ট। এই একচেটিয়া প্রচারবার্তার প্রচেষ্টার ব্যতিক্রম হচ্ছেন প্রফেসর মুহাম্মদ ইকুনা। তার গ্রামীণ ম্যাক কিভাবে সেটি বাংলাদেশের পৃথিবীতে খুব আবার নিয়ে প্রকাশ করা হবে। এই সাম্প্রদায়িক কথা বলার সময়েও আবার কিছু গরিবজনরা ভুলে মনে রাখ সব সময় মনে করিয়ে দেওয়া





যা বা থেকে পালিয়ে পালিয়ে বসে বাগাড় ফুরে বেড়িয়েছিল তখনো আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে শ্রুত সেবেছি। কিন্তু পক্ষ বহর এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার খুব কাছাকাছি দিয়ে শ্রুত সেবেছি। কিন্তু পক্ষ বহর এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার খুব কাছাকাছি দিয়ে শ্রুত সেবেছি।

৩৬

৪. হার রাজনীতির নামের যে ব্যাপারটি চালু হয়েছে সেটি সম্পর্কে যদি কেউ এর থেকে মনে কোনো মূল্যায়ন করতে পারেন, আমি তার সঙ্গে যে কোনো ধরনের বিতর্ক করতে বসতে রাজি আছি। কারণ, আমি জানি আমার এই উক্তিটি কোনো কাছাকাছি থেকে কখনো না, এটি একটি বাস্তব সত্য। আমি নিজের সাথে যখন এটা শিখেছি, কারো বাসায় থেকেই গিয়ে উঠি কখনো এটা থেকে থেকে আসা থেকে তখনে আমি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম হালকা আসা থেকে তখনে আমি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম হালকা আসা থেকে তখনে আমি।

৩৭

৫. আমি এখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছি এটিকে এক সময় সফলতম, সেশনজটীল বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে করা হতো। এটি এখন আর সফলতম বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস একাধিকবার ছাড়ানোর হুজুর রঙিত হয়েছে। এটি সফলতম আর নিজেকে সেশনজটীল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দাবি করতে পারবে না। ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ছাড়া হয়ে গেছে, পরীক্ষার রুটিন নেওয়া হয়ে গেছে, পরীক্ষার সিট ফেলা হয়ে গেছে, টিক এই সময় ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখ রবিবেলা ছাড়ানের দুটি রাজনৈতিক অঙ্গ সলগঠনের মধ্যে হঠাৎ করে একটি ব্যাপক ভাড়াপেল শুরু হয়ে গেলে। বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে

৩৮

হতো। পরীক্ষা শিফট গেলো আড়াই মাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ ছাত্রের ছাত্রছাত্রী, সেটা পরীক্ষা শিফট, কয়েক শ কর্মকর্তা-কর্মচারী যখন থেকে এই সময়টুকু করে গেল সম্পূর্ণ কিনা কারণে। পৃথিবী এগিয়ে বাসে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এগিয়ে বাসে পায়ে পায়ে, বিশাল একটি বিপ্লব ঘটেছে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে; আমরা জানি এই বিপ্লব আমাদের শেষ সুযোগ—এটিতে আমাদের অংশ নিতেই হবে। পৃথিবীর সেরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই আমাদের। কিন্তু আর্থিক অর্থ ছাড়া আমাদের দিকে পেলিয়ে সেটা হচ্ছে সুরক্ষার। সমস্ত শক্তি ব্যয় করে একটু একটু করে একটি জিনিস শীত করানো হয়, এরফলে অর্থহীন হলে এসে তাদের ঘরের মধ্যে সেটাকে ধসিয়ে দিতে পারে এক মুহুর্তে। তাকে নিষেধ করার কেউ নেই, তাকে ধামানোর কেউ নেই।

৬. আমরা যদি সুযোগ নেওয়া হতো তাহলে এই দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতার কাছে গিয়ে আমি হাতজোড় করে বলতাম, আপনাদের কাছে আমি দুটি জিনিস চিহ্না চাই। এক, আপনাদের ছাত্র সলগঠনটি বাতিল করে দিন। দুই, হেভাল-বর্মফোর্টের সময় যেভাবে হাসপাতাল, ডিকিন্সকেন্স তার আওতাভুক্ত থাকে টিক সেভাবে কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে তার আওতাভুক্ত রাখুন।

৩৯



### লাল নীল শিক্ষক

ছাত্ররা রাজনীতির নাম করে হারানি করে বিপ্লববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবে, একম সমর মিটাই গোয়ের একজন ছাত্র আমার কাছে জানতে চাইলো কবে থেকে ক্রাস জল হবে। কোনো কারণে আমি সেনিন তিরিকি মেজাজে ছিলাম, ছাত্রটির নিকে রক্তকু করে বললাম, "আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো?"

হেসেটা দুর্বল পলায় বললো, "ভালো কাকে জিজ্ঞেস করবো?"

আমি কঠিন পলায় বললাম, "বরং আমিই তোমাকে জিজ্ঞেস করি। বলো, কবে বুঝাবি বন্ধ করে আমাদের ক্রাস নিতে দেবো?"

"স্যার, আমরা তো কিছু করিনি।"

"ভালো কে করেছে?"

"কিছু ছাত্র।"

"তুবি কি ছাত্র না? তোমাদের কেউ কেউ কি এই ঘটনা ঘটায়নি?" আমি আগুল দিয়ে হেসেটিকে দেখিয়ে বললাম, "তুমি যেহেতু একজন ছাত্র তোমাকেও অন্য ছাত্রের কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে হবে। যারা এখানে 'কমি' করে তুমি তাদেরই একজন।"

ছাত্রটি আহত মুখে আমার নিকে তাকিয়ে রইলো, কি বললে বুঝতে পারলো না।

কিছুদিন পরের ঘটনা। শহরের কোনো এক অনুষ্ঠানে একজন মানুষ আমার নিকে এগিয়ে এসে। যেহেতু আমি বাচ্চা-কচ্চাদের দু'একটি পই সিংখি সেই হিসেবে অনেকের ধারণা, আমি সমাজ-সাহিত্য-শিল্প এসব তরুণজীবিত বিষয় নিয়ে অনেক কিছু জানি, তারা কৌতূহল নিয়ে এসব আলোচনা করতে আসেন। আমি তরুণতার বিষয়ের আলোচনায় হা হা করে কাটিয়ে দেই। আজকে অবশি সে সমস্যা হলো না। যিনি কথা বলতে এগিয়ে এসেছেন তিনি নিজে থেকেই অনেক কথা বলে গেলেন। শিল্প-সাহিত্য-সমাজ শেষ করে শিক্ষা নিয়ে কথা বললে

কলকে হঠাৎ করে খেমে গিয়ে বললেন, "এই দেশের শিক্ষার ব্যাঘাত বেড়ে গেছে।"

"ব্যাঘাত বেড়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আপনারা যেভাবে পলিটিক্স শুরু করেছেন—দেয়া হয়ে যায়।"

"আমরা?"

মানুষটি কঠিন মুখে বললো, "হ্যাঁ, আমরা। ইউনিভার্সিটির মাস্টাররা। আপনারা লাল রক্তের মাস্টার, নীল রক্তের মাস্টার। ছাত্রদের নিয়ে পলিটিক্স করেন—হ্যাঁ?"

আমি অপমানিত হয়ে প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে গিয়ে পেমে গেলাম। মার কিছুদিন আগে নিগ্রাই একটা ছাত্রকে ছাত্ররাজনীতির সজেকের সন্ত্রাসী কাজের জন্য মোবারোপ করেছি। যদি সেই ছাত্রটিকে তার সহপাঠীদের সন্ত্রাসী কাজের দায়তার নিতে হয় তাহলে আমি কেন অন্য শিক্ষকদের রাজনীতির দায়তার না দিয়ে পার পাৰো? আমি মাথা নিচু করে মানুষটির গালাগাল হজম করে নিলাম। দেশের সবচেয়ে বড়ো বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে কতজন মানুষের এ রকম নীচ ধারণা হয়েছে? কেউ কি একবার সমীক্ষণ নিয়ে দেখবেন? আমার ধারণা সমীক্ষণ নেওয়া হলে লজ্জায় আমরা কেউ মুখ দেখাতে পারবো না। আসলে আমরা কী, সেই সত্যটি চাপা পড়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ আমাদের সম্পর্কে কী ভাবে—তার প্রস্নিতে।

আমি মুক্তরাবি থেকে শাক্যপাকিভাবে দেশে ফেরার আগে '৯২ সালে একবার এসেছিলাম, দেশে কোনো-একটা কাজকর্ম ভিয়ে নেওয়ার জন্য। শব ছিল দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার, খুব সম্ভব কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার পছন্দের তালিকার সবচেয়ে ওপরে। জীবনের সবচেয়ে জাননময় এবং তরুণত্বপূর্ণ সমষ্টিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছি। সেই যুগে তিন বছর পরপর অর্দা পুরীকা হতো। আমরা এই তিন বছর পায়ে হাতেরা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। পরীক্ষার আগের তিন মাস পরজা বন্ধ করে পড়ে কেতা ততে করে সেবো এ রকম পরিকল্পনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসি জীবনটুকু কাকিনে চা-সিগারেট খেয়ে, কার্টন হলের লানে আড্ডা মেয়ে এবং টি. এন.

সি. তে শব্দিক করে কাটিয়ে গিয়াম। পরীক্ষার আগের তিন মাসের অপশট্টই যেক্টে নিলে শব্দিক সমষ্টিত্বের খুঁটি বড়োই মধুর। কাজেই নিজের দেশে কর জীবন শুরু করার আগে প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে পড়বে নিগ্রাই কী?

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শৌক নিতে গেলাম। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যারা শিক্ষক হিসেবে তাদের অনেকেরই এখনো আছে, কেউ কেউ এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব তরুণত্বপূর্ণ জালায় আছেন। আমি এতটা খবর না নিয়েই পরিচিত একজন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি এখনো আমাদের সাবেক ছাত্র হিসেবে খুব রোজ করেন, দেশে ফিরে আসছি তখন খুব খুশি হয়ে উঠেন। বললেন, "এই তো ছাত্র।" দেশের হেসেটা যোগ দেখে ফিরে না আসে তাহলে কেনম করে হতো? তবে হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার নিয়মকানুন আছে। সবরের কাগজে সার্ভুলার হবে, এগ্রিকেশন করবে, নিসেশন কমিটি করবে—

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি কেনর জানি।"

"আরো একটা ব্যাপার।"

"কি ব্যাপার?"

"তোমাকে নিয়ে আমাদের নিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। তবে অনেকের—"

"অনেকের?" আমি অধক হয়ে বললাম, "অনেকেরা কারা?"

আমার ছাত্রজীবনের শিক্ষক রপ্তের উত্তর না দিয়ে বললেন, "তুমি বজা এক কাজ করো।"

"কি কাজ?"

"তুমি 'অমুক' স্যারের সঙ্গে দেখা করো।"

তিনি "অমুক স্যার" হিসেবে যে শিক্ষকের নাম বললেন, তিনিও আমার শিক্ষক। দেশে এসে এমনিতেই আমি তাদের লগার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "ঠিক আছে, দেখা করবো।"

"হ্যাঁ, দেখা করে তাকে তুমি বলো যে, তুমি এই ডিপার্টমেন্টে আসতে চাইয়ো। কিন্তু একটা জিনিস খুব সাবধান।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি জিনিস?"

"তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করেছো সেটা কিছু বলো না।"

"বলবো না?"

"না। কিন্তুকেই বলবে না।"

আমি মাথা নেড়ে হুতকিরিত মতো 'অমুক' স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনিও আমার একজন গিয়া শিক্ষক। আমাকে সেবে খুব খুশি হলেন, দেশে ফিরে আসতে চাইছি তখন আরো বেশি খুশি হলেন। বানিকশপ এটা—সেটা নিয়ে তথ্যবাক্য বলে হঠাৎ চিত্তিত্তমুখে বললেন, "তোমাকে নিয়ে মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না।"

"সমস্যা?" আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি সমস্যা স্যার?"

স্যার আমার রপ্তের উত্তর না দিয়ে গভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "রিঙ্ক নিয়ে কোনো কাজ নেই। তুমি এক কাজ করো।"

"কি কাজ?"

"তুমি 'অমুক' স্যারের সঙ্গে দেখা করো।"

অমুক স্যার হিসেবে তিনি যে শিক্ষকের নাম করলেন তিনি সেই প্রথম শিক্ষক যার সঙ্গে আমি প্রথম দেখা করেছি এবং যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

আমি শৌক গিলে বললাম, "দেখা করবো।"

"আর শোনো", আমার স্যার নিচু পলায় বললেন, "তুমি যে আমার সঙ্গে আগেই দেখা করেছো সেটা কিছু বলো না। যবহার।"

আমি মাথা নাড়লাম, "না, বলবো না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বড়ো বিয় বিশ্ববিদ্যালয়, আমার জীবনের মধুরতম খুঁটি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে, তবুও আমি শেষ পর্যন্ত এখানে শিক্ষকতার জন্য চেষ্টা করিনি। আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া হয়েছে শিক্ষকতার সবচেয়ে সখানজনক কাজটির জন্য আমাদের করার আগেই কমতাপানী মলতপোর অনুগ্রহ চিন্তা করার একটি অসম্ভবজনক কাজ করে আসতে হবে। সেই হলনাটুকু করতে আমার থিা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু চিন্তাবাবনা আছে। আমাদের সর্বজন প্রচেষ্টা রটিপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র

রাজনীতি নিয়ে গ্রীক আমার মনের মতো কিছু সত্যি কথা বলার পর আমি ভোরে ভাগে সেই বিষয় নিয়ে কিছু লেখাওছি করেছি। অসম্ভব পাঠক আমার কাছে চিঠি দিয়ে আমার বক্তব্যকে সার্বজনীন করেছেন। ভোরে ভাগে এই বিষয় নিয়ে এক-দুজন ছাত্র, কিছু অভিজাত চিঠিপত্র-প্রতিবেদন দিয়েছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো বড়ো প্রফেসরের কেউ কেউ আমাকে আমার লেখার জন্য আন্তরিক অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে রহস্যের ব্যাপার, এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো বড়ো প্রফেসরকে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তারা যদি গোপনে আমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারেন তাহলে প্রকাশ্যে সেই কথাটি বলতে বিধা কেন? আমার মতো দু'চারজন 'সাক্ষর' তাদের যেটুকু নিয়ে টুকটুক করে যাক, এক-দুইজন আমার কি তাদের বিশাল পদার এক বা দিতে পারেন না?

অবশ্যই পারেন, কিন্তু তারা সিদ্ধেন না। আমার ধারণা ব্যাপারটা জটিল। ছাত্র রাজনীতি বেরকম ছাত্রদের আঁচিপুঁচে বেঁধে ফেলেছে, শিক্ষকদের রাজনীতিও ঠিক সেভাবে শিক্ষকদের বেঁধে রেখেছে। শুধু তাই নয়, মনে হয় দুটি মাত্র এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ছাত্র রাজনীতি এবং শিক্ষক রাজনীতি মেন এক পরিবারের দুই ভাই হাত ধরাধরি করে বড়ো হচ্ছে।

অষ্টোত্তর ১ তারিখ 'আজকের কালজ'—এর শেষ পৃষ্ঠায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে একটি বড়ো প্রতিবেদন বের হয়েছে। আমি সেখান থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি : 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনোদিতরা সারা দেশের অবস্থা খুব শক্তিশালী না হলেও তাদের চিন্তা মূগুর প্রসারী। বিনোদিতরাইয়ের একটি গুণ জামাতের সঙ্গে অবস্থান করলেও বৃহত্তর অংশটি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভ্রমতা ভাগাভাগি করে নিয়ে ছাত্রদলকে ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত করতে মনোযোগী। এই বৃহত্তর অংশটি মনে করছে বাকস্ব নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেল বিজয়ী হলে তারা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবে, এমন তারা খুব কৌশলে পা ফেলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সবচেয়ে নাজুক অবস্থার রয়েছে জামাতপন্থী সবুজ গুপ। . . . ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিক্ষকদের হেয় করার জন্য এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়নি, বরং এটি লেখা হয়েছে তাদের প্রশংসা করে। যে ভিনিসিটী ভাষা করে লক্ষ্য করার মতো মতো হেঁচ শিক্ষকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এক সময়ে তাদেরকে একটি ভা দিয়ে প্রকাশ করা হতো (কেনিছি সেটি নির্বচনী প্যানেলের কাগজের কপ)।

ইদানীং রাখ্যাক না রেখে বিনোদিতরা বা আওয়ামী লীগপন্থী বলা হয়। ওপরে যে লেখাটি উল্লেখ করেছি সেখানে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে 'পন্থী' শব্দটুকু তুলে দিয়ে সরাসরি 'আওয়ামী লীগ' বা 'জামাতি' বলা হয়েছে। যারা লিখেছেন তাদের এভাবে লিখতে বিধা হয় না। যারা পড়ছেন তাদেরও সন্দেহ হয় না। আমরা সবাই স্বীকার করে নিজেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়েই সবাইকে নিয়ে রাজনীতি করেন। আমরা সবাই দলভুক্ত। রাজনৈতিক দলের পরিচয়টি আমার প্রথম পরিচয়।

শিক্ষকতার কাজটি চাকরি নয়—এটি জাতির সঙ্গে বা সমাজের সঙ্গে আত্মত্যাগের এক ধরনের স্বীকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যে বেতন নিয়ে তার চাকরি শুরু করেন, ঢাকা শহরের সমস্ত বাড়িরা তাদের ডাইভারকে তার চেয়ে অনেক বেশি বেতন দিয়ে থাকেন। তবুও এই দেশের সেনার টুকরো ছেলেপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তারা কারণ একটাই, এখনো মনের পটীরে তারা বিশ্বাস করে এটি চাকরি নয় এটি একটি মহৎ জীবিকা, এটি একটি জাদুর্শের সন্ধ্যা, নিজের সঙ্গে আত্মত্যাগের স্বীকার। যে স্বপ্ন নিয়ে একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয় সেখানে শ্রী ভাষার পড়ানোর কথা লেখা রয়েছে, পড়েপড়া করার কথা লেখা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যবিন কাজে সাহায্য করার কথা লেখা আছে, কিন্তু রং মেখে মলভুক্ত হওয়ার কথা কোথাও লেখা নেই। তাহলে এই পরিচয়টি কেন আমাদের সবচেয়ে প্রথম গ্রহণ করতে হবে?

বর্তমান ছাত্র রাজনীতির ক্ষতিকর নিক নিয়ে একবার আমি বসে খুব বড়ো বড়ো কথা বলছি তখন একজন ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাস করলো, "সার, আমরা আমাদের রাজনীতি বন্ধ করলে আপনারা কি আপনারা রাজনীতি বন্ধ করবেন?"

আমি ছাত্রটির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। একজন লাল শিক্ষক বা মিল শিক্ষক কি প্রস্তুতির উত্তর দেবেন?

—ভোরে ভাগ, ২২ অক্টোবর ১৯৭৭

### টেলিভিশন বিক্রি হবে

আমি টেলিভিশন কেনি খুব কম। টেলিভিশন নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু খিটরি রয়েছে। আমার ধারণা, টেলিভিশন বেশি দেখা হলে চারপাশের পৃথিবীটাকে লালসে এবং জলো বলে মনে হতে পারে। টেলিভিশনে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ইচ্ছা—চোখ এবং কানকে খুব ব্যস্ত করে রাখার করে মনোযোগকে ধরে রাখা হয়। কাজেই একবার চটকমার কক্ষের টেলিভিশন সোয়াম দেখা অভ্যাস হয়ে গেলে নিজে থেকে কেবলও মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাস হলে যেতে পারে। আমাদের চারপাশের যে পৃথিবী সেটি টেলিভিশনে সোয়ামের মতো অকতকে, রঙিন, উজ্জ্বল এবং চটকমার হয়। পার-পারীয়া উজ্জ্বল হাত-পা মেতে চোখ ঘুরিয়ে কথা বলে না, লিখন থেকে দৃশ্যমান্যরী আবেগ সঙ্গীত থাকে না, কাজেই টেলিভিশনের সোয়ামের কুলায় আমি এই পৃথিবীটাকে মেহাভে উত্তেজনাদীন পানসে এবং একঘেয়ে মনে হয়, খুব বেশি চোখ মেতোয়া হবে না। আমি সেই ভূমি নিয়ে চাই না বলে একদমের টেলিভিশন দেখতে চাই না।

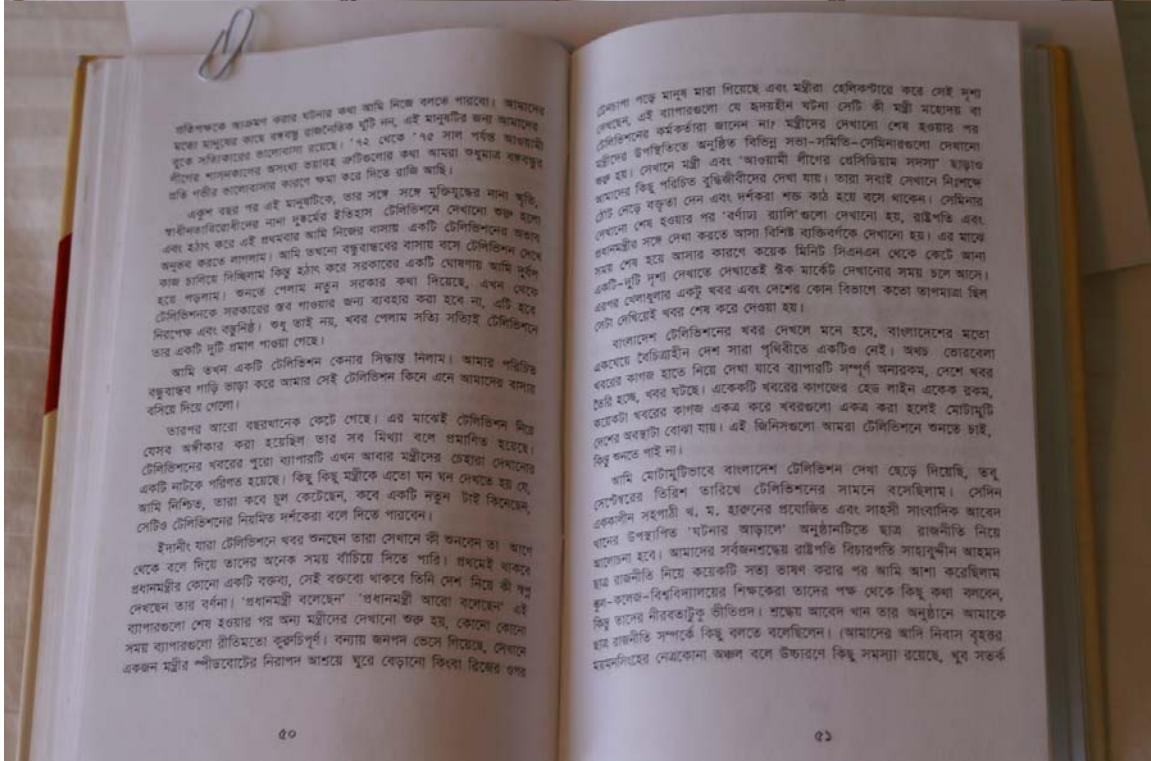
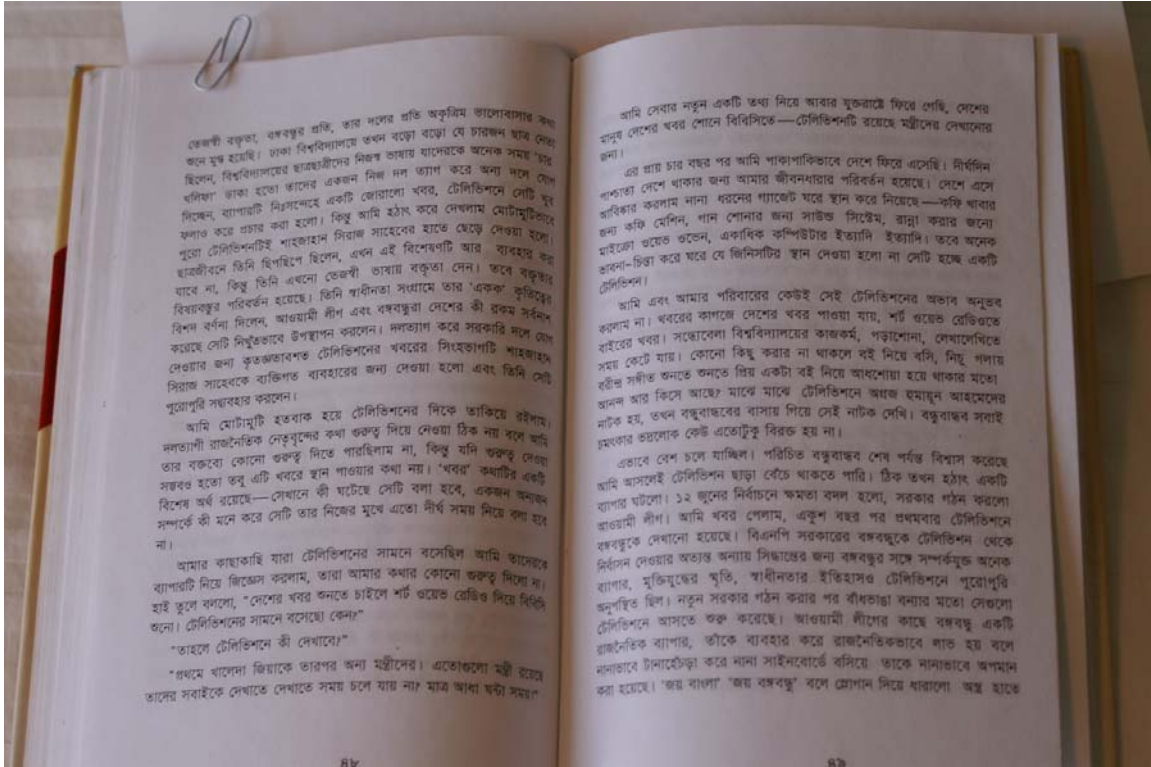
ব্যাপারটি অর্ধশ মিটেও কঠিন নয়। আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্রাম তখন টেলিভিশনের চ্যানেলের সখ্যা ছিল শতাধিক। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ক্রিমেট কট্রোলের বোতাম টিপে টিপে আঙুল ঘাষা হয়ে গেলেও সজিতকার ছাত্র টেলিভিশনের লেখার মতো একটি অনুষ্ঠানও খুঁজে পাওয়া যেতো না। ছাত্র টেলিভিশনের সামনে বসতাম খুব কম, সুইচ টিপেই যেহেতু চ্যানেল পাঠে সেজা যেতো তাই বসে বসে সেটিই করতাম—টেলিভিশন দেখা থেকে ছাত্র বেশি হতো আমাদের ব্যায়াম।

যুক্তরাষ্ট্র থাকাকালীন সময়ে কয়েক বছর পর হাতে কিছু অর্থ জমা হয় একবার দেশে ফেরতে আসতাম। দীর্ঘদিন পরপর দেশে আসা হতো বলে দেশে সমাটাকে মনে হতো খুব মূল্যবান। আশানুরূপের কাছাকাছি বসে সময় কাটিয়ে নিতাম। টেলিভিশন খুলে বসে থাকার ইচ্ছে করতো না।

১৯৬৬ সালে দেশে ফেরতে এসে খবর পেলামের জন্য একবার টেলিভিশন খুলেছিলাম। তখন জেনারেল এরশাদ সোর্গের প্রকাশ্যে ব্যস্ত করলেন আমার কেন আমি মনে হয় জেনারেলের বেশ শাসনের মাঝে একটা রাজত্ব রাখতে পারি। টেলিভিশনে তিনি খবর পড়লেন তিনি একটি দুটি কথা বলেই হঠাৎ করে মুখ বন্ধ করে ফেললেন এবং তার জায়গার সেখানে জেনারেল এরশাদকে দেখা যেতে শুরু করলো, তিনি কোনো এক জায়গায় ভাগ দিলেন। জেনারেল এরশাদকে বা তার বক্তব্য শুনে না, যে ভিনিসিটী দেখে আমি চমকে উঠলাম সেটি হচ্ছে তার ভাষা। তিনি এক ধরনের ঘামা ভাষায় কথা বললেন, "আমি আফনানের লাইখা। সোয়ামের মাঝে ইজুল বানাইয়া দিছি, ত্রিক বানাইয়া ফলাইছি....." এই রকম কথাবার্তা শুনে আমার পায়ে লোম দাঁড়িয়ে গেলো। একটি দেশের বেলিডেক—তা তিনি যতো অন্যায্যভাবেই বেলিডেক হয়ে থাকুন না কেন—কিন্তু বাংলায় কথা বলতে পারেন না এটা হতে পারে না। তিনি নিজস্বই মোটোটি চলনসই শুধু বাংলায় কথা বলতে পারেন, তাদের তিনি এভাবে কথা বলছেন কেন? দেশের সাধারণ মানুষের সামনে কথা বলতে হলে কি 'কইরা ফলাইছি' 'বানাইয়া ফলাইছি' এই ভাষায় কথা বলতে হয়? ব্যাপারটি যে অসভ্যতা কিংবা অন্যায় কিংবা প্রকারণ মনে হতে পারে সেটা কি একবারও জেনারেল এরশাদের মনে হয়নি? আমি টেলিভিশনের কাছাকাছি বসে থাকা আমার ভাইবোন এবং পরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম কিন্তু তারা ব্যাপারটিকে মোটাও পা করলো না। আমি কয়েকদিনের জন্য এসে এসব দেখে অবাক হইছি, দেশে যারা আছে তারা এতশো নিভানিন দেখছে, দীর্ঘ-চকির-নারী এইসব নিয়ে নানা ধরনের উৎকট বসিকতার তারা অভ্যস্ত, তাদের কাছে এটি কোনো ব্যাপারই না।

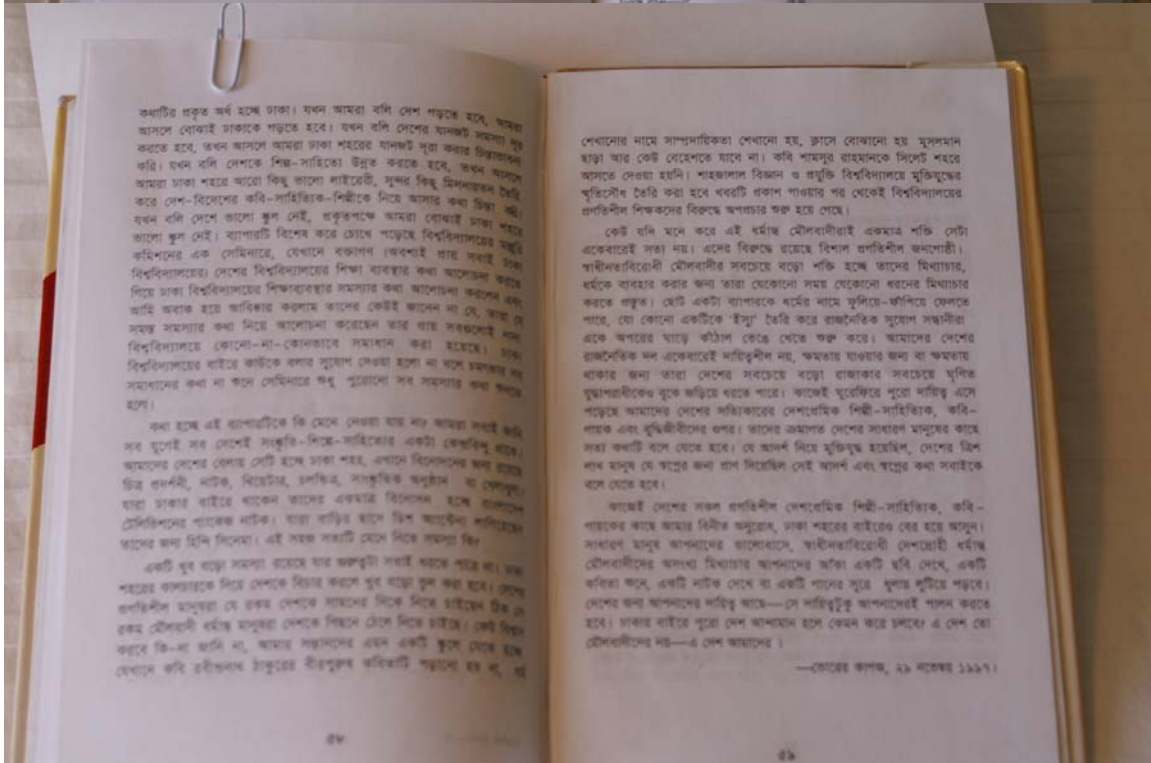
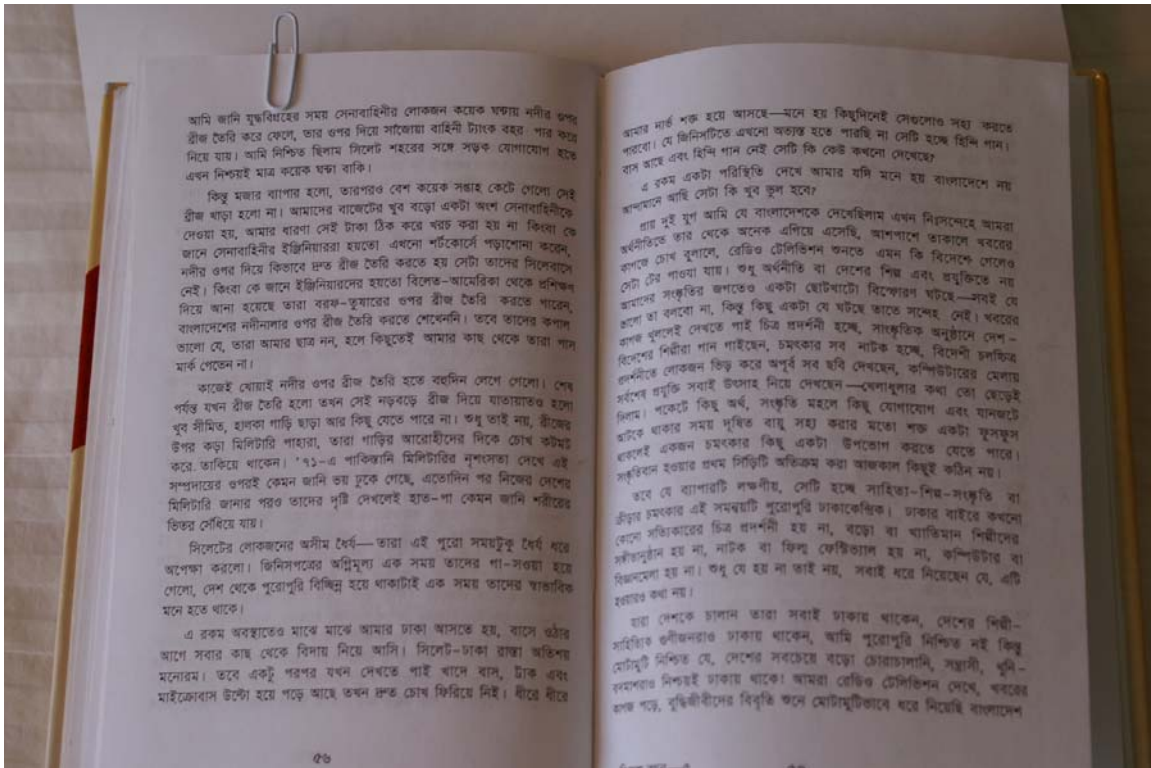
বলা যেতে পারে সেবার আমি এক ধরনের শক পেয়ে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলাম। পরের বার দেশে এসেছি '৯২ সালে। ততোদিনে এরশাদের পতন হয়েছে, নির্বাচন হয়েছে। আওয়ামী লীগ নিশ্চিত ছিল ইলেকশনে জিতে ক্ষমতায় যাবে, কিন্তু ক্ষমতায় এসেছে বিনোদিত। এই ছয় বছরে টেলিভিশনের প্রতি আমার মমতা এতোটুকু বৃদ্ধি পায়নি। আমি দেশে ফিরে এসে টেলিভিশনের ধারে কাছে খুব একটা ঘাই না, কিন্তু একদিন কী মনে করে খবর শুনতে চাইলাম। সেদিন আমাদের ছাত্র জীবনের সমসাময়িক সাতকে ছাত্র নেতা শাহজাহান সিরাজ তার নিজের মল ত্যাগ করে বিনোদিত হোদ দিলেন। আমি ছাত্র জীবনে তার











[www.shopnil.com](http://www.shopnil.com)  
we request you to join our text and voice chat

### তাসের ঘরে থাকবে না

মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা একটা তাসের ঘরে বাস করছি। তাসের ঘর তৈরি করা খুব সহজ নয়—এর কোনো ভিত্তি থাকে না বলে এটি তৈরি করতে হয় খুব কৌশলে, একটা তাসের উপর অন্য তাসটি বসাতে হয় খুব সতর্ক হয়ে, একটু অসতর্ক হলেই পুরো ঘরটি হুড়মুড় করে পড়ে যায়। তখন আমরা 'কৌশল' নতুন করে ভাব করতে হয়। খেলাতাসে টেবিলের ওপর তাসের ঘর তৈরি করা এক কলা কিন্তু যিনি মনে হয় আমাদের পুরো দেশটিই একটা তাসের ঘর, খুব সাবধানে সেটিতে সীঁড় করে রাখা হয়েছে, আমরা নড়কোঁড়তে পারি না, নিখোঁস নিতে পারি না, একটা কথা বলার আগে মনবার ভাবতে হয়, মন খিঁক তাকাতো হয় তাহলে হঠাৎ করে নিজেদের খুব অসহায় মনে হতে থাকে। সে যিনি একটা ঘরের মতো হয়, তাহলে তার আশ্রয় হচ্ছে তার ভিত্তি। আশ্রয় মতো কোনো ফাঁকি থাকতে পারে না, আশ্রয় কোনো ছুঁয়াছুরি হয় না। আর স্বাধীনতার স্বাধীন বছর পরেও আমরা অবাক হয়ে দেখছি এই দেশের একেবারে মূল ভিত্তিতে কী ভয়ানক শোঁজামিল। মুক্তিযোদ্ধারা তাসের ঘরের ঘর দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছে, অবত চারপাশে তাকালে মনে হয় ব্যাঘাট যেন হঠাৎ করে ঘটে গেছে, তুল করে ঘটে গেছে। যারা একদিন আত্মরিক্তভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যই করেছে তারা এখনো এই দেশে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, একটার পর একটা সরকার সেটি সেজে যায়, একটাবার একটা কখনো বসে না, একটা বড়ো ভগ্নমি পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। একটা ভবিষ্যৎ, একটা দেশ এর থেকে বড়ো আত্মবিশ্বাস আর কিভাবে করতে পারে।

আমরা একটা তাসের ঘরে আটকে পড়ে আছি—কথাটি আমার নতুন করে মনে পড়লো কয়েকদিন আগে। পুরানো কাগজ খঁটখাটী করছে করতে হঠাৎ হাতে একটা কাগজ উঠে এলো, মিসেস জাহানারা ইমামের সাংবাদিক সম্মেলনের অনুদ্বিগ্ন। তিরানখইয়ের জাদুঘর মাশে মিসেস জাহানারা ইমাম

৬০

নিউইয়র্কে এটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। আমি আমার জীবনে এই একটা সাংবাদিক সম্মেলনই দেখেছিলাম, সাংবাদিকেরা যে আসলে খুব নিরপেক্ষ নয় তারা যেটা বিশ্বাস করে সেটাই চেষ্টা-চরিত্র করে তাদের খুব থেকে বেঁচে করে অন্যতে চায় সেটা আমি সেদিন আবিষ্কার করেছিলাম। মিসেস জাহানারা ইমামের সাংবাদিক সম্মেলনটির অনুদ্বিগ্ন করেছিলাম আমি নিজেই। সেটি পড়তে পড়তে আমার আরও সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেলো। শেষ লাইনটি পড়ে আমি একটা নির্দিষ্টমাত্রা ফেলেছি, সেখানে লেখা রয়েছে, "..... সেদিন পেশাল টাইমুনাল করে গোলাম আমের বিচার শুরু হয়ে যাবে সেইদিন আমি মনে করবো যে আমার কাজ কিছুটা শেষ হয়েছে এবং তখন হয়তো আমি কিছুটা সেবারেবির জগতে ফিরে যেতে পারবো।"

মিসেস জাহানারা ইমাম আর সেবারেবির জগতে ফিরে যেতে পারেননি। এই সাংবাদিক সম্মেলনের সেরে বছর পরে মিশিয়ানের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন। তার কাছ কিছুটা শেষ হয়েছে সেই সান্নাটিকৃত তিনি নিয়ে যেতে পারেননি, পেশাল টাইমুনাল তৈরি হয়নি, গোলাম আমের বিচারও শুরু হয়নি। শুধু যে বিচার শুরু হয়নি তাই নয়, বিচার শুরু হলে সেরকম আয়োজনও নেই। এইমাত্র কয়েকদিন আগে প্রধান বিচারী দলের নেত্রী গোলাম আমেরের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা করেছেন। আমার বড়ো জানতে ইচ্ছে করে, এরকম সাংস্কারের সময় তারা কী নিয়ে আলোচনা করেন। বিচারী দলের নেত্রী কি একটাবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে দেশকে ক্ষতি করার জন্য তারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল, যে দেশের গোলাম সেরদানের অকলীল্য হত্যা করেছিল, যে দেশের জাতীয় পতাকা পদনগত করার জন্য বিচার হয়েছিল মতো ঘটে গিয়েছিল, সেই দেশের মাটিতে পড়িয়ে সেই ব্যাভাসে নিঃশ্বাস নিতে কেমন লাগে। আমি নিশ্চিত, তাকে সেই প্রশ্ন করা হয়নি। আমাদের বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রীকে একজন একটা ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছিল, এই দেশে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কি বন্ধ করা হবে। প্রশ্নটি প্রধানমন্ত্রী রায় মেয়ে উল্লিখে মিলেন, তার কথা শুনে মনে হলো এটি একটা হেলমানুবি প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্নটি তো হেলমানুবি প্রশ্ন নয়, বাংলাদেশের বিশ লক্ষ মানুষ বুকের হৃৎ দিয়ে অনেকগুলো প্রশ্নের সঙ্গে তো এই প্রশ্নেরও উত্তর নিয়ে গিয়েছিল, এখন হঠাৎ করে এই প্রশ্নটি হেলমানুবি প্রশ্ন হলো কেন।

৬১

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মতো কঠোরতম স্বাধীনতা পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। স্বাধীনতার পরবর্তী দুই ঘণ্টারও বেশি সময়ের নানা ধরনের গণতান্ত্রিক, জাতিগতাত্মক, আধাশপতাত্মক, সামরিক, আধাশাসনাত্মক, এমনকি সরকারহীন শাসনের সময় নানা ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ কখনো ছোঁর করে, কখনো কৌশলে দেশের মানুষের মাঝার চোকাচোরা চেষ্টা করা হয়েছে। সমগ্রভাবে অধীকার করার পর্বটি করা হয়েছে নির্লক্ষভাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী শোষণকে হয়েছে কৌশলে। টেলিভিশনে রাজাকার বলা নিষিদ্ধ ছিল। দেশে গণহত্যা করেছিল হানাদার 'বাহিনী'—সাক্ষাৎ কবাবু বলা যেতো না। এই পিঠির রকমের মস্তিষ্ক-প্রকাশনের ভিতরে থেকেও দেশের মানুষ যে কতটা ভিত্তি একেবারে গোড়া থেকে এখন পর্বত দুটকাবে বিশ্বাস করে এলো সেটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত ভিত্তি। এই দেশের মানুষ একটা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে, সেই খুঁটিটুকু কখনো তারা বিস্মৃত হবেন না। যারা এই মুক্তিযুদ্ধের শুরু তারা এর বিরোধিতা করতে পারে, এটিকে বিপর্যয় করতে পারে কিন্তু এটিকে অধীকার করতে পারে না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের যে ঘৃণাতম শত্রু সেই জামাতে ইসলামী ছাত্র সন্যাসনকেও আমি 'মহান মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে ভাব দিতে চাইছি। স্বাধীনতার স্বাধীন বছর আমরা অনেক চড়াই-উত্থাই পার হয়ে এসেছি, অনেক বিষয় নিয়ে অনেক ইচ্ছাকৃত বিলম্ব সীঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশের মানুষের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে গৃহযোধ্যাতা থেকে হঠাৎ মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে হয়। যারা এর পক্ষে, তাদের বলতে হয়; যারা এর বিরোধী, তাদেরও বলতে হয়। এই দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে, সামাজিকভাবে গ্রহণ করেছে, রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করেছে, জাতিগতভাবেও গ্রহণ করেছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধকে যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি তাহলে সেই আশ্রয়ের জন্য এই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেটিও গ্রহণ করতে হবে। ডিসেম্বর মাসে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করার জন্য, গলা কপিয়ে বিদ্রুতি দেওয়ার জন্য এই মুক্তিযুদ্ধ যদি মুক্তিযুদ্ধের ফসল হলে স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার শক্তি দিয়ে যদি স্বাধীনতার শত্রুদের রক্তা করা হয়, লাগান করা হয়, শক্তিশালী করা হয়, তাহলে স্বাধীনতার অপমান করা হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করা হয়। এই কঠোর

৬২

দেশে যদি স্বাধীনতা-বিরোধীদের বিচার করা না হয় সেটি হবে একটি ভয়ঙ্কর প্রবন্ধন, একটা নির্লক্ষ ভগ্নমি। একটা সরকারের পর অন্য একটা সরকার সেই ভগ্নমি করে যেতে পারে কিন্তু আমরা কেন সেটি সচ্য করবো।

৩

এদেশের স্বাধীনতা-বিরোধীদের নাকি ক্ষমা করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমা করা শুরু হয়েছে। 'ক্ষমা' কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যে কেউ যে কোনো মানুষকে ক্ষমা করতে পারে না। আমার ওপরে কেউ অভিচার করলে অন্য কেউ তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। অনুরক্ত অপরাধী আমার কাছে ক্ষমা চাইলে আমি তাকে ক্ষমা করবো।

বাংলাদেশে এই ব্যাঘাটটি ঘটেনি। এই দেশের স্বাধীনতা ট্রেবিলে যেন আলোচনা করে কাগজে ছাঁকি বাফর করে হয়নি। এই দেশের স্বাধীনতা হয়েছে রক্তাক্ত করে। যারা এই স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তারা আলোচনা ট্রেবিলে মুক্তিতে দিয়ে বিরোধিতা করেনি, তারা বিরোধিতা করেছে রক্ত-মাংসের মানুষকে হত্যা করে, মাঝের বুকে থেকে সন্ত্রাসের কেড়ে নিজে, মেয়েদের সন্ত্রাস নষ্ট করে। কোনো সরকার এই অপরাধীদের ক্ষমা করতে পারে না, এদেরকে ক্ষমা করতে পারে শুধুমাত্র সন্তানহারা মায়েরা, সন্তান হারানো মেয়েরা। তার জন্য সেই সব অপরাধীদের নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধীরা একটাবারও তাদের সোঁদ স্বীকার করেনি, ক্ষমা চাওয়া তো অনেক দূরে ব্যাপার। শুধু যে ক্ষমা চাইনি তাই নয়, তারা আকালন করে বলেছেন, আমরা কোনো অপরাধ করিনি। তবিশ লাখ মানুষের গণহত্যার সজির অংশ নেওয়া যদি অপরাধ না হয়, লাখ লাখ মেয়ের ওপরে শৈশবিক নির্ধারন যদি অপরাধ না হয় তাহলে এই পৃথিবীতে 'অপরাধ' কী হতে পারে।

যারা কখনো অপরাধ করেছে বলে স্বীকার করেনি, যারা কখনো ক্ষমা চায়নি তাদেরকে কি ক্ষমা করা যায়। তাদেরকে ক্ষমা করে নেওয়া, অর্ধাৎ বিচারের কাঠগড়ায় সীঁড় না করানোর একটিমাত্র অর্থ—আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া, তারা আসলেই কোনো অপরাধ করেনি। আমি যখন পরবর্তী ঘটনায় সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি, তাদের আত্মত্যাগের কথা, স্বীকারের কথা বলি তখন হঠাৎ করে আমাকে ধিমায়েজের মতো খোঁম হতে হয়; আমি অত্যাধ

৬৩



একটা সহজ গল্পের উত্তর দিতে পারি না। সত্যিই যদি মুক্তিযোদ্ধারা অসহ্য হার থাকে তাহলে তাদের হাজারেকটা এই দেশে এখনো সশস্ত্রভাবে বেঁচে থাকা আরো শত হুই লক্ষ আমাদের এই একই ধরনের আরো লক্ষ্য নিয়ে বেঁচে থাকা। সত্যিভাবে মতো একটি মহান দলিলে ইন্ডোমনিটি বিপ্লবের মতো একটি কুসংস্কৃত জলক লেপন করে রেখেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষকে সত্যিভাবে হত্যা করে তাঁর আত্মবিকৃত খুনিকে এই দেশে সশস্ত্র যুদ্ধে বেঁচে নেই। এই পুঁই লক্ষ্যের অবসান ঘটেছে। এখনও এর মতো আরো একটি লক্ষ্যের অবসান ঘটতে হবে, এই দেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে।

৪. আমাদের দেশের স্বাধীনতা সন্ধ্যায় এই দেশের ভিত্তিকে গড়ে দিয়েছিল—অত্যন্ত শক্ত ছিল সেই ভিত্তি, তার মাঝে এতটুকু খাল ছিল না, এতটুকু ফাটল ছিল না, এতটুকু দুর্বলতা ছিল না। সেই শক্ত ভিত্তির প্রভাবতো একটি একটি করে খুলে দেওয়া হয়েছে—প্রথম গভরাটি অপসারণ করেছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব গঠিত স্বাধীন বাঙালিদের প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার। দালাল অব্যাহত স্বাধীনতার বিরোধীরা বিচার করার জন্য যে প্রসিকিউশন টিম তৈরি করা হয়েছিল সেটিতে কোনো রকম সহযোগিতা না করে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। কে দিয়েছিল? এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতা সন্ধ্যায় তাদের নেতৃত্বের কথা গৌরবের সঙ্গে স্বরণ করে, আমরাও করি। স্বাধীনতার পরপর দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে দেওয়ার সেই কাণ্ডকে আমরা বিচার দিই, তাদেরকেও দিতে হবে। দেশের আত্মশ্রী মাঝে কোনো অসুস্থতি থাকতে পারবে না, ভুল করা হয়ে থাকলে সেই ভুল স্বীকার করে সশোধন করতে হবে। দেশকে তার শত ভিত্তির মাঝে উপস্থাপন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে দেশদ্রোহীদের ক্ষমা করার যে পর্ব শুরু হয়েছিল পরবর্তী সরকারগুলোতে সেই পর্ব পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হতে থাকে। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহ আজিজুর রহমানের মতো একজন কুখ্যাত দালালকে প্রধানমন্ত্রী করে ফেলেন। শুধু তাই নয়, আরো কিছু দালাল-রাজাকারকে মন্ত্রী বা সচিব সচিব হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন, এই দেশে আরো

সাংসদগণকে রাজনীতি করার ব্যবস্থা করে নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হন। দেশকে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় টেনে নিয়ে দেশের সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ করে নিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা পূর্ণ ভিত্তি ওপর দাঁড়িয়েছিল, কলা চেতনা পরে তার পুরোটাই তিনি টেনে সত্যি করে ফিঁসে।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানে আটকে পড়া হেনর বাঙালি সীমান্ত পার হওয়ার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বরা পড়তো তাদের বিচার করে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। স্বাধীনতাসে এসে তিনি যে তার অসমার বিচার কাজ সমাধি করার চেষ্টা করেনি সন্তুষ্ট হন। তখনই তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হালকা উড়িত। তার শাসনামলে তিনি তার পুরোনো স্বাধীনতার বিরোধী দালাল-রাজাকার সহযোগীদের পুনর্বাসন করার জাতি অত্যাচার মুচাক্কাতে পেরে গিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার ঠিক বিশ বছর পর নির্বাচনে জিতে বাংলাদেশ জিয়া বালাসেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ক্ষমতায় এসেই তিনি আমাদের ইসলামীর সঙ্গে রাজনৈতিক একটা সম্পর্ক গড়ে তুললেন। আমাকে ইসলামী সন্তুষ্ট প্রথমবার এ দেশে তাদের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে, গোলাম আমাকে—যে নাকি একজন পাকিস্তানের নাস্তিক—তারে আদমি হিসেবে ঘোষণা করলো।

যে কাজটি দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর করার কথা ছিল তখন সেই কাজটি করার জন্য এগিয়ে এসে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ। মিসেস জাহানারা ইমাম—মিদি একজন যা, পুঁইবু এবং লেখিকা—দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে সংযুক্ত করে ফেললেন। তিনি আমাদের দেশের জাতি রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে থেকে গণআন্দোলনে গোলাম আমদের বিচার করেন। সারা দেশের তরুণদের মধ্যে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রতীক জাগিয়ে তুললেন। বলা যেতে পারে, পুরো দেশ যেন অন্ধকারের অতল গল্লের মাঝে ঘুটে যাকিল হঠাৎ সেটি ধমকে দাঁড়িয়ে আমাদের চিহ্ন বুঝে গেলো।

মিসেস জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি যখন একমুখে নরসাতক দেশদ্রোহীদের চিহ্নিত করে যান্নেন ঠিক তখন আওয়ামী লীগ তাদের উদ্ধার কাজে এগিয়ে এলো। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ জামাতে ইসলামীকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করে যেতে লাগলো। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দল বলে থারা আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে

হঠাৎ করে আমাদের ইসলামীর গ্রন্থাগারের কাছে গেলো—একটি দেশের জন্য এর চাইতে বড়ো ক্ষতি কী হতে পারে?

বিধানসভার ১২ই জুনে নির্বাচনের কথা নিয়ে আওয়ামী লীগ লীগ একই বছর পর আবার ক্ষমতায় এসেছে। যারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের রসুফ ছিল অনেকদিন পর তারা প্রথমবার সন্তোষ নিশ্বাস নিতে পারবে। অত্যাচারের পরকার অত্যাচার চমকতার কয়েকটি মানবিক কাজ করেছে তার একটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আপদজনক তেঁকে তাদেরকে সম্মানিত করা। আমরা মাকেও একদিন আত্মশ্রম করে নিয়ে আরো অসংখ্য শহীদদের স্বপ্নদলের সঙ্গে গার হাতে একটি পদক তুলে দেওয়া হলো। সেই পদকে প্রথমবার বাংলাদেশ সরকার আমার বাবার খুঁটি প্রতি সম্মান দেবিয়ে মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথা স্বরু করেছে। এই পদকটি সন্তুষ্ট অত্যন্ত গর্বমূলক একটি হাজার জলক, কিন্তু আমাদের কাছে তার মূল্য অনেক। যত্নের সোয়ালে খুঁটিয়ে রাখা সেই পদক ফলকটি দেখে আমার সন্তানরা আমার মুক্তিযোদ্ধা পিতার গৌরবে গৌরবিত হয়। আজ থেকে শত বছর পরে আমাদের বংশধররা এই পদকটি সন্তোষ পায় করে তাদের না-লোবা পূর্বপুরুষকে স্বরণ করবে। জাতীয় পরজার অত্যাচার শাল সূর্যটির নিকে তাকিয়ে তারবে এই রক্তবর্ণের গারু কটির জন্য যে ঠিক পদ মাদুর যুদ্ধের রক্ত দিয়েছিল তার মধ্যে তাদের কোনো-এক পূর্বপুরুষ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্বরণ করার জন্য এই দেশকে কেন দুই মনর হওয়া করতে হলো?

বহু মূহে আবার একটি বিজয় দিবস এসেছে। আমি নিশ্চিত এই বিজয় দিবস উপলক্ষে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধকে স্বরণ করবো। দেশের বড়ো রাজ-ভনীজন, দেশের নেতাসম্রাট, মন্ত্রী-আমলারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাদের ভালো কল-কলবে, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা স্বরণ করিয়ে দেবেন। কিন্তু এটা মুক্তিযুদ্ধের, সব সম্মান প্রদর্শন অল্প বিসর্জন রক্তপাতকে পুরোটা এটা অর্থহীন প্রতিজ্ঞা বলে মনে হয়, এক ধরনের ফাঁকা খুঁটির কথা মনে হয়, যখন যে সন্তুষ্ট যুদ্ধাপরাধী এই সব মুক্তিযোদ্ধাদের নৃশলভাবে হত্যা করেছে, যখন এখনো বিচার করা হয়নি। ঠিক যখন আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা বলি, আমি নিশ্চিত, সেই সময়ে আত্মত্যাগের স্বাধীনতার বিরোধী গোষ্ঠীর চেয়ে গোলাম আম, একাত্তরে মালেক মল্লিকতার শিক্ষামন্ত্রী আমদা অজী বঙ্গ, বঙ্গবন্ধু বাহিনীর নেতা ও সংগঠক মজিউর রহমান মিলানী, মুফক কামলজামান, শাস্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং জিয়াউর রহমানের মন্ত্রি

সকল আত্মত্যাগ আদমি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী সেনাপ্রাণের ম্যোসন সাক্ষী, এরশাদ সরকারের মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধী হত্যাকারে অভিযুক্ত রক্তজন আত্মত্যাগ মন্ত্রা, এককালীন বামপন্থী নেতা পাকিস্তানি ইসলামীর বাহিনীর সন্তোষ জাহানারার রাষ্ট্র, একাত্তরের জাতি হিসেবে তৃত্বাধি আত্মত্যাগ তাদের নেতা এবং তাদের মতো আরো অনেক কোনো নিদ্রাসন আশ্রয়ে অটুতগি হেসে বলাই, এই মেঘা, কোমরা আমাদের এখনো স্পর্শ করতে পারনি।

সত্যিই আমরা তাদের স্পর্শ করিনি—অবিধ্বাসা হলেও সত্যি তাদের গরতিকে কাটতে মজিবু নিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এইসব দেশদ্রোহী নাস্তিকদের অনেক মৃত্যুর পর এই দেশের মাটিতে কবর দেওয়ার জায়গা পাচ্ছে না। এতুনের বইয়ের সময় আমি এই লেখার উদ্দেশ্য করা মানুষদের নাম জাতীয় গণতন্ত্র কমিশনের বিদ্যোৎ থেকে নেভা। বিশ্ববিদ্যালয় একতর জাতীয় মুদ্রাণ এবং শৌচাগার খুলতে সেখা। রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতার বিরোধী হওয়ার কারণে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমন্ত্রিত না হওয়ার উদাহরণও রয়েছে—কিন্তু এ সবই এক ধরনের সামাজিক অপমান। মানবতার বিপক্ষে অমানবিক অপরাধ করার কারণে সৃষ্টিকর্তা পরতো তাদের যোগ্যমুখ শাস্তি সেবেন সেটি চিন্তা করে কেউ কেউ শাস্তি পেতে পারেন কিন্তু তাদেরকে তার আগেই পৃথিবীর বিচারেও শাস্তি পেতে হবে। শেঁহারা কিছু কিছু তরুণ জবাব নতুন করে সশস্ত্র সন্ধ্যায় করে অসমার মুক্তিযুদ্ধকে সমাধি করে এইসব অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলে কিছু আমরা অত্যাচার শক্তি নিয়ে অপরাধের বিচার করতে চাই না। দেশের নতুন মুক্তিযুদ্ধ হবে, অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য, অশান্তি কুশিকা থেকে মুক্তির জন্য, সাংসদগণের বিল থেকে মুক্তির জন্য এইসব যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে আমাদের গণতান্ত্রিক নিয়মের ভিতরে, দেশের আইনের ভিতরে, আমাদের দেওয়া অধিকারের ভিতরে।

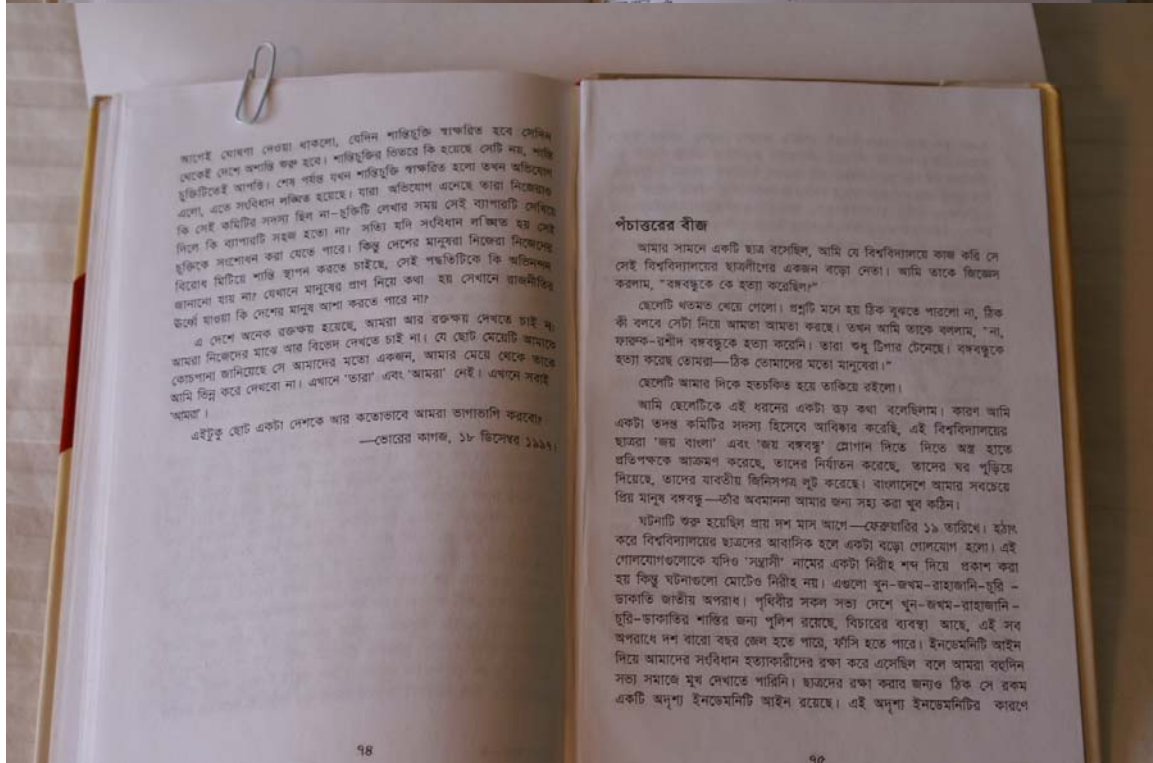
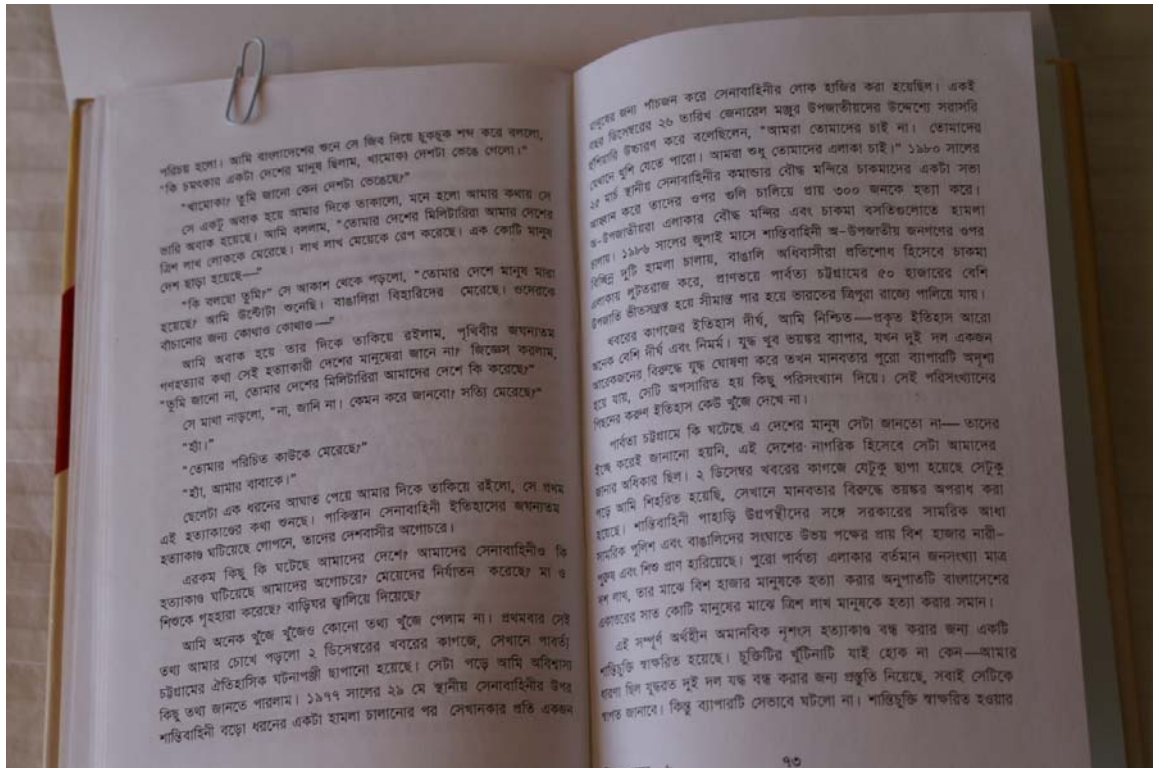
প্রায় দুই মূল পরে আমরা একটি সরকার পেয়েছি যারা নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি বলে বিশ্বাস করে। আমরাও বিশ্বাস করতে চাই। আমাদের বিশ্বাসকে সম্মান করে এখন এইসব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের যে শত ভিত্তিতে এই দেশ সৃষ্টি হয়েছিল আমি সেই দেশে থাকতে চাই। ভিত্তিহীন আদর্শহীন গৌজমিলে ভরা একটি তাদের ঘরে আমরা থাকতে না।

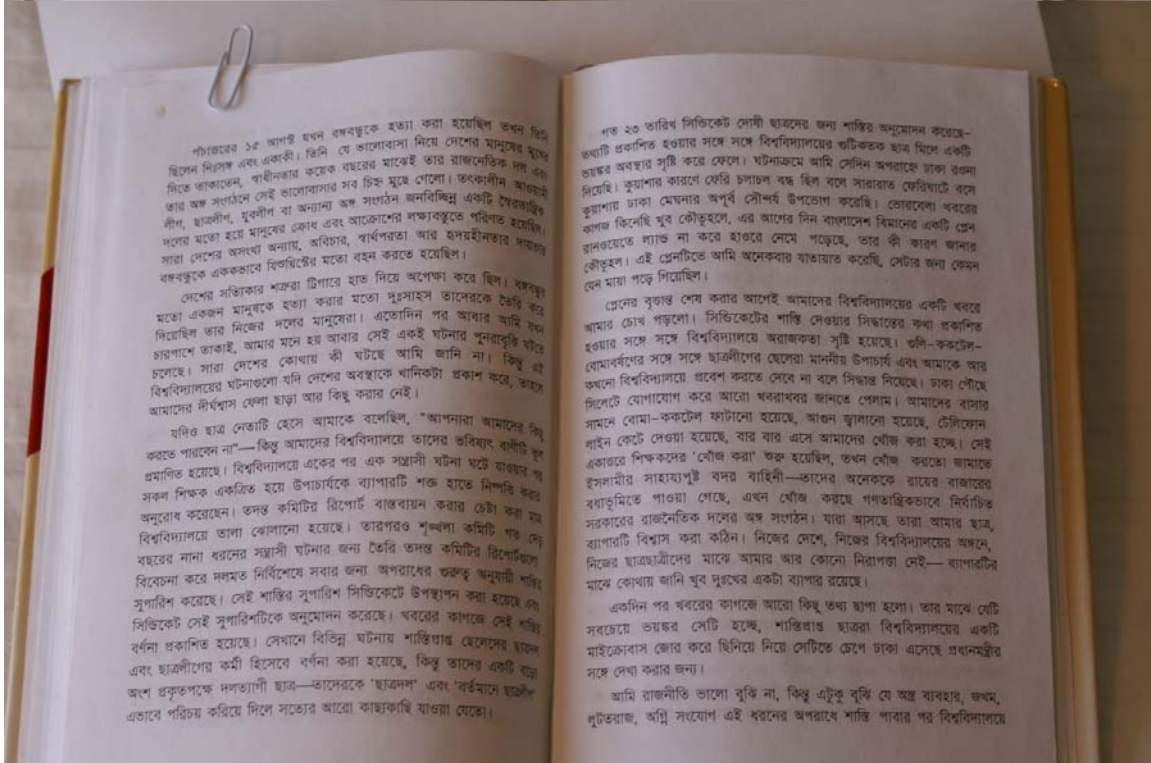
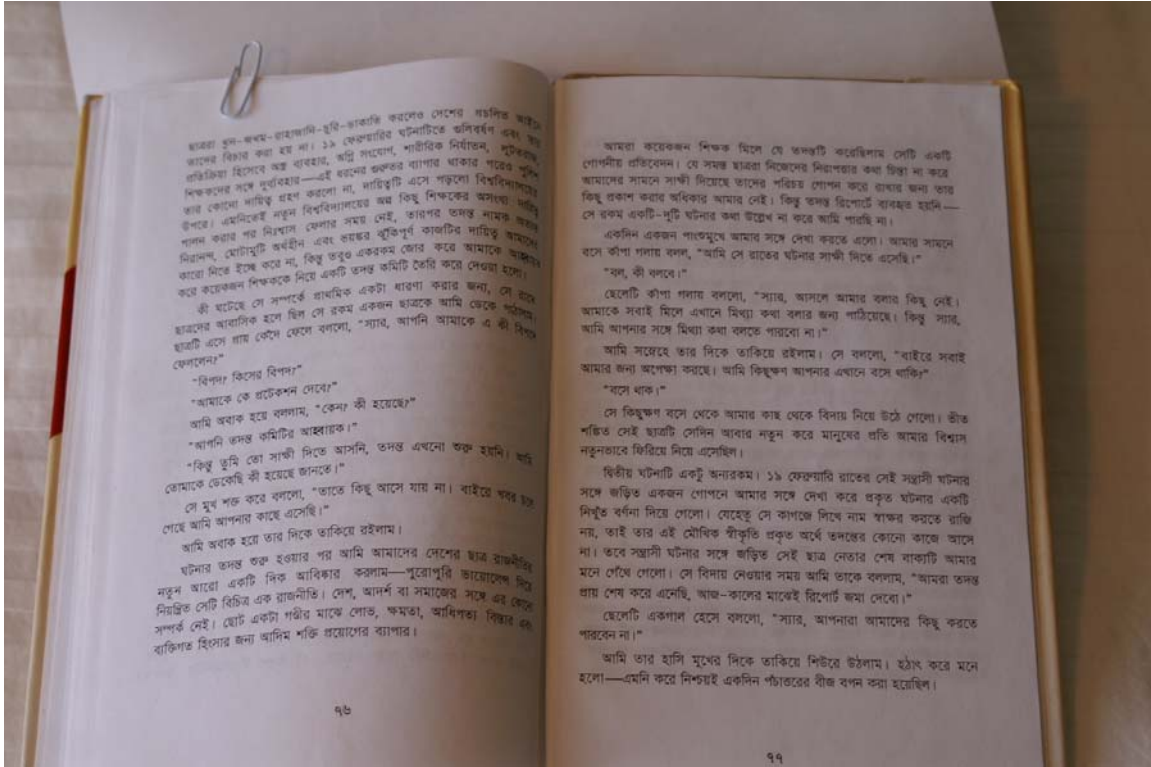
—তারের কাল, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭।



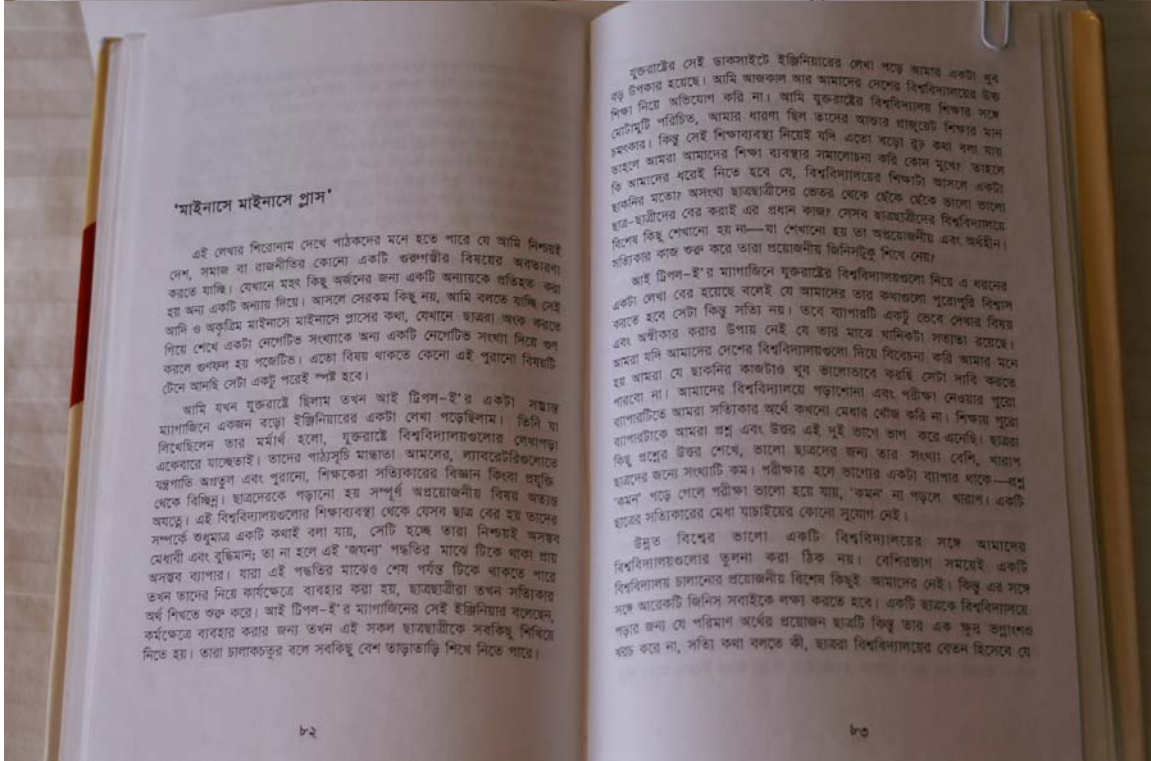
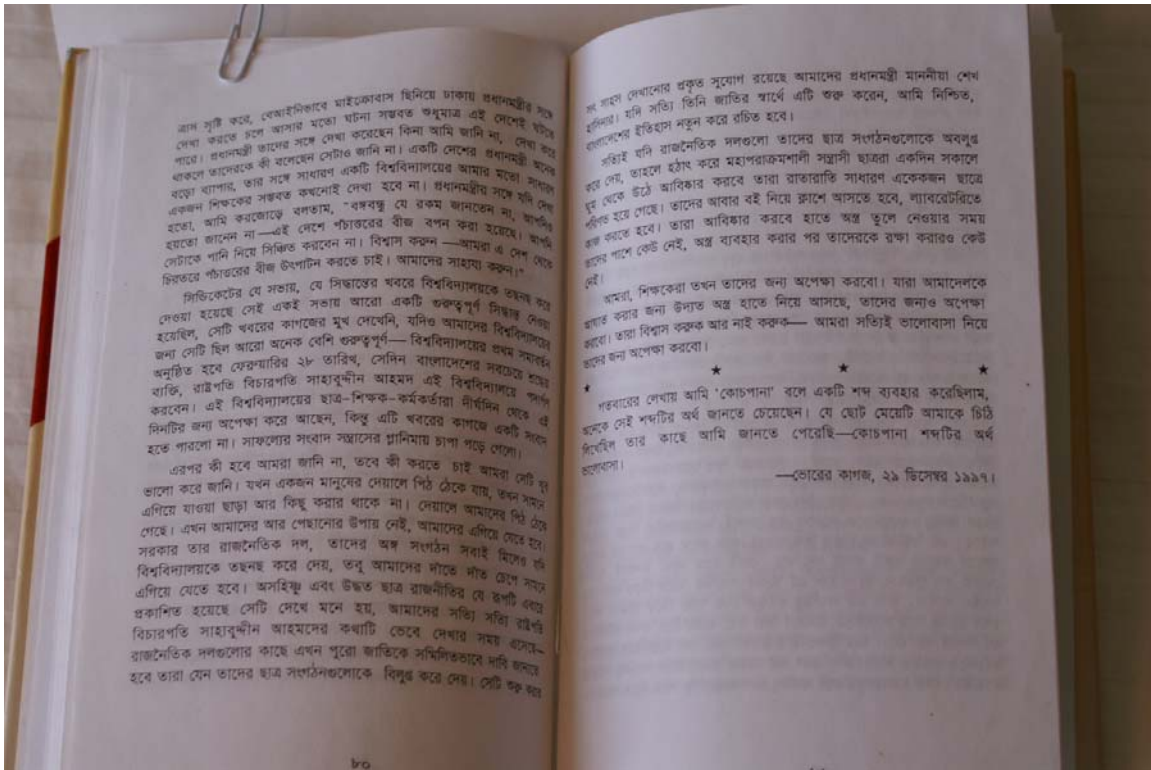




[www.shopnil.com](http://www.shopnil.com)  
we request you to join our text and voice chat







পরিমাণ অর্ধ সের সেটা তুলতে তার থেকে বেশি টাকা খরচ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সেটা আনুমানিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেতন দেখলে খানিকটা আনুমানিক করা যায়। আমি মোটামুটি নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতাবাদের মতিনিক্রমতা সেওয়া যায় সময় মতো তাদের সন্তানদের পড়াশোনা শিখিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হবে— তাহলে অভিজ্ঞতাবাদী ছাত্র বেতন হিসেবে আরো বেশি টাকা নিতে খুশি হয়ে যাবারী হবেন। আমাদের দেশের কোচিং সেন্টারগুলো হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, অভিজ্ঞতাবাদী এই সব কোচিং সেন্টারের গিঞ্জে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন সেটা একটি সেখান মতো বিবরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করতে যেহেতু তেমন কোনো অর্থ ব্যয় হয় না সে কারণে জাতীয়তাবাদী পড়া শেষ করার জন্য ছাত্রদের তেমন পরজ্ঞাও দেখা যায় না। বিনামূল্যে কিছু একটা খরিয়ে নিলে আমরা সেটা অবহেলা করে ফেলে দিই, অথচ একই জিনিস পড়ার পুরো ব্যয় করে কিনলে সেটা ঘরে এনে সাজিয়ে রাখি—এখানেও মনে হয় অনেকটা সেই একই অবস্থা।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ফেলার ছাত্রছাত্রী সর্বোমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে আমি তাদের রাস নিয়ে একটা বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করেছি। কোনো একটি জিনিস তাদের পড়ানোর পর তারা এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, তারা সব সময় জানতে চায় এই বিষয়টিতে রপ্টা কিভাবে করা হবে। রপ্টা জেনে গেলেই তারা উত্তরা প্রবৃত্ত করে সেটা মুখস্থ করে ফেলে। পরীক্ষায় হবে সেই রপ্টা সেওয়া হলে তারা নিশ্চিন্তভাবে তার উত্তর লিখে ফেলবে কিন্তু রপ্টা একটা অন্যভাবে লিখলেই পরীক্ষার হলে আক্ষরিক অর্থে ‘মহামারী’ হয়ে যায়। এটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি আমাদের দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি একেবারে নিয়ম করে আমাদের হেলেমেয়েদের চিন্তা করার ক্ষমতারিক পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের পড়াশোনার পুরো ব্যাপারটি এখন মুখস্থ করার ক্ষমতার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। পরীক্ষার যেটা আসবে সেটা যেন আগে থেকে জানা থাকে—সেটাই হচ্ছে পড়াশোনার উদ্দেশ্য। অথচ এরকমটি হওয়ার কথা ছিল না, একটি জিনিস শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে অন্য একটি কাজ করা, কিন্তু সেটা কোথাও আর দেখা যায় না। পরীক্ষাতে তো নয়ই, রাসসকলমেও না, সৃজনশীলভাবে এখানে ক্রীতিমতো অপরূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমি অসংখ্য ঘটনার কথা জানি যেখানে ছাত্রছাত্রীরা রপ্টার উত্তর নিজের মতো করে

দিয়েছে বলে তাদের শাসন করা হয়েছে। হু হু করে বেশ খোঁকার জন্য সত্যি কি আর খুব দূরে যেতে হয়?

আমাদের হেলেমেয়েরা যে চিন্তা করতে চুলে গেছে আমি তার একটা প্রমাণ দেই। সেগেটিত সংখ্যাকে সেগেটিত সংখ্যা দিয়ে ভুল করে সেটা যে পড়তিত সংখ্যা হয় সেটা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুব কম বরসেই শিখে যায়। এমন কোনো ছাত্রছাত্রী নেই যারা অক করতে গিয়ে এটা ব্যবহার করেনি। কিন্তু আমি বলি ধরে বলতে পারি এই সহজ জিনিসটার প্রকৃত অর্থ তারা কখনো চিন্তা করে দেখেনি। যদি তাদেরকে বলা হয়, তারা তাদের জীবনে দেখেছে বা ব্যবহার করেছে এরকম একটা জিনিসের উপস্থাপন নিক সেটা ‘মাইনাস মাইনাস প্রাস’ হয়েছে, তারা সেই উপস্থাপন দিতে পারবে না। আমার কথা যারা বিশ্বাস করেন তারা কোনো একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে জিজ্ঞাস কর দেখতে পারেন।

ছাত্রছাত্রীরা এই সহজ গাণিতিক ব্যাপারটির একটি উপস্থাপন যদি দিতে না পারে সেজন্য কিছু তাদেরকে দোষ দেওয়া হবে না। এ ধরনের একটি ব্যাপারে যে প্রশ্ন করা যায় কিংবা সেটা দিয়ে চিন্তা করা যায় তার কখনো তাদেরকে বলা হয়নি। (আমি নিশ্চিত এর পরেও কেউ কেউ ভেবে ভেবে এর উপস্থাপন বের করে ফেলবে—আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যতাই ঠোঁট কড়ক করে মাঝের কেউ না কেউ তার পুরো সৃজনশীলতা নিয়ে বেঁচে থাকে। সেটাই আমাদের মত নিকতনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।)

২.

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাদের যে-সমস্যাটি নিয়ে খুব বেশি মনোযোগ দেয় না কিন্তু যেটা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি খুব বড়ো সমস্যা—সেটা হচ্ছে নকল। নকল যে শুধুমাত্র আমাদের দেশের সমস্যা তা সত্যি নয়, পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি এ রকম সমস্যা রয়েছে, সেটা সমস্যার জন্য সবাই ঠোঁট করে থাকে, অনেক কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ করে মিনা নকল পথ বের করে থাকে। তবে আমাদের দেশে নকল সমস্যাটি যতো জটিল এবং যতো প্রকট সেরকম আর কোথাও নয়। আমি একজন নটিকর্মীকে জিনিষ বাবা পরীক্ষার নকল করার সময় একজনকে ধরেছিলেন বলে নকলরায় হেগেটি ছুঁকিঘাত্য করে তাকে ঘেরে ফেলেছিল। নকল করা এখন এসেছে একটি অন্যর কাজ নয়। মনে হয় এটা এক ধরনের অবিচার।

৮৫

আমাদের দেশে নকল করার প্রবণতা এতো বেশি তার কারণ খুব সহজ—পরীক্ষার যে সকল বিষয় লিখতে হয় তার উত্তর নকল করে দেখা সম্ভব। শুধু তাই নয় পরীক্ষার আগে আগে নকল করাকে সাহায্য করার জন্য ছোট ছোট গাইড বই বের হয়, খুব সহজেই বেনে সেগুলো প্রকিয়ে পকেট করে নেওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপারটি একটা অন্য রকম হতে পারতো, পরীক্ষার এমন প্রশ্ন করা সম্ভব যার উত্তর নকল করে দেওয়া সম্ভব নয়, সেই সব প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর কোথাও দেখা নেই এবং একজন পরীক্ষার্থী শুধুমাত্র ভেবে ভেবে তার সম্ভাব্য উত্তর লিখতে পারে। এ ধরনের একটি ব্যাপার ঘটলে কী চমৎকার একটি ব্যাপার ঘটতো। পরীক্ষার রচনা হিসেবে ‘লৌকা অমণ’ না হয়ে যদি আসতো ‘নিউটনের মতিনিক্রমতা কন্সিউটার থাকতো’ তাহলে একটি ছাত্র বা ছাত্রীর সৃজনশীলতা, ভাবনা ওপরে দখল, চাটিয়ে শেখার ক্ষমতা কী চমৎকারভাবেই না খাড়াই করা যেতো। এটা এত এমন কিছু পুরোখ্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই তো এভাবেই পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমরাও কী প্রাকৃতিক সর্বাঙ্গী পদ্ধতিনের স্রোতা না করে ধীরে ধীরে সেনিকে যেতে পারি না? সত্যি সত্যি যদি পরীক্ষার পাওয়া নম্বর সেই ছাত্র কিংবা ছাত্রীর মেধার একটি পরিচয় হতো সেটা কী চমৎকার একটি ব্যাপার হতো না?

৩.

বেশ কিছুদিন আগে দুজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে। তারা শহরে একটা কোচিং সেন্টার খুলতে যাচ্ছে, আমাকে নিয়ে সেটা উদ্বোধন করতে চায়। তাদের অনুরোধটি শুনে আমি চমকে উঠলাম। শহরে পকেটমারের একটা ইনস্টিটিউট খোলা হলে এবং আমাকে সেটা উদ্বোধন করতে বললেও আমি সেভাবে চমকে উঠতাম। আমি দুজন কর্মকর্তাকে অবশি সেটা করতে পারলাম না, উন্মোচনীয়া করাবার্তা বলে এবং লিখে আমি ইতিমধ্যে অনেক শব্দ তৈরি করে রেখেছি—তাদের সংখ্যা আর বাড়তে চাইলাম না। ভুলভাবে এবং বিনয়ের সঙ্গে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরেও তারা জিনে খোঁকের মতো আমার গিঞ্জে লেগে রইলো। আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম কোচিং সেন্টার তৈরি করে জ্ঞান শাকম ধরা-ছোয়ার বাইরের জিনিসটাকে কেউ-কুই ছোট ছোট টুকরা করে ত্রিক সময়ে উগড়ে দেওয়ার জন্য পানিত ভলে বাইরে সেওয়া যে এক ধরনের সামাজিক অপরাধ হতে পারে—কর্মকর্তারা

৮৬

সেটা জানেন না? ফিকট খোলায় কোচিং হতে পারে, সাক্ষর বা কৃষিকের কোচিং হতে পারে কিন্তু শিক্ষার কোচিং কেমন করে হয় সেটা এখনো আমরা জানে রহস্য। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে না কয়েক ভর্তি করিয়ে দেওয়ার ছুঁকি যে একটি অন্যর ছুঁকি হতে পারে সেটা কি কেউ কখনো ভেবে দেখেছে? বিভিন্ন সোর্টে ডাক্তার করা ছাত্রছাত্রীদের যদি খানিকটা পিচ বছর কোচিং সেন্টারের সেসব বিজ্ঞাপন ছাড়া হয় তবে শিশুরের কান্নাটা কেউ কি কখনো উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন?

৪.

আমাদের দেশের বড়ো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকটপূর্ণ একটি বিভাগের প্রধান আমাকে তাদের ডায়েরিটা দেখিয়ে বলেছিলেন, “এই সেন্টেন, আমাদের একেবারে নতুন ফেল পেকচারার তাদের সবার কালার টেলিফোন আছে। অথচ আমাদের পুরোনা অনেক প্রফেসরদের কালার এখনো টেলিফোন নেই।”

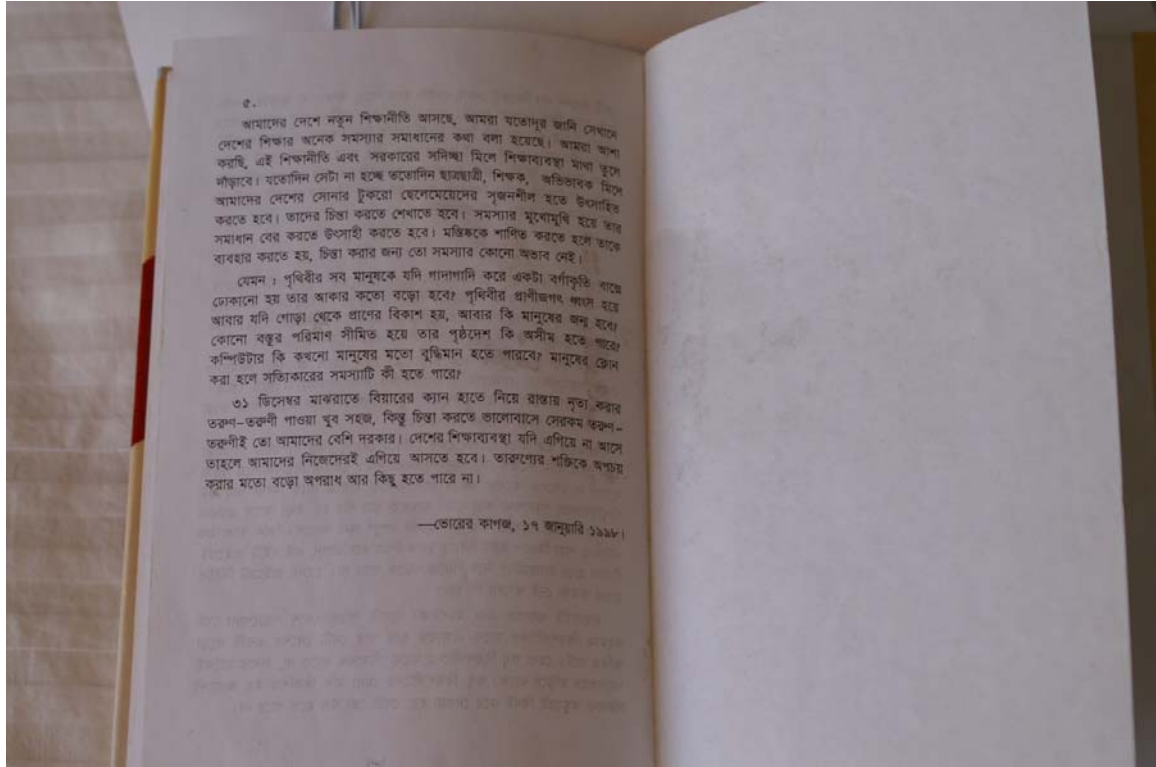
আমি ভুল বুঝতে তার নিকে তাকলাম। তিনি হেসে বলেন, “আমাদের দেশে পড়াশোনার ব্যাপারটি বড়োশোক্তদের জন্য একচেটিয়া হয়ে গেছে। পরীক্ষার ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা হতে পারে তারা আজকাল সবই বড়ো সোকার হেলেমেয়ে।”

আমাকে এর আগে এভাবে কেউ দেখিয়ে দেয়নি, কিন্তু ব্যাপারটি যে সত্যি হতে পারে আমি নিজের সেটা অনুমান করেছিলাম। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পেলেও অনেক অর্থ থাকলে এখনো বাইরে গিয়ে কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা যায়। আমাকে প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে একজন শিক্ষাবিদ একই সমস্যার কথা বলেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্য বিজ্ঞান বইটি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এই বইটি প্রাইভেট টিউটর ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা নিজে নিজে পড়তে পারে না। তাদের প্রাইভেট টিউটর রাখার ক্ষমতা নেই তাদের কী হবে?

সমস্যাটি শুধুতর এবং মানসিক। একটি নির্দিষ্ট দেশে পড়াশোনা যদি শুধুমাত্র বিতশালীদের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় সেটা দেশের একটি বড়ো অভিত বটে। মেধা শুধু বিতশালীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, সবার মাঝেই সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে। শুধু বিতশালীদের মেধা যদি বিতশিত হয় আমাদের সম্ভাবনা অল্পরেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয়, সেটা তো ভুল হতে পারে না।

৮৭





[www.shopnil.com](http://www.shopnil.com)

we request you to join our text and voice chat